ঘরে বাইরে

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ভারতী-ভবন
২৪-৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী
ভারতী-ভবন
২৪-৫এ, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মূল্য—১৲ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীদীনেশচন্দ্র গুহ
মেট্রোপলিটান প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং হাউস্ লিঃ
৯০ লোয়ার সারকুলার রোড, ইণ্টালী, কলিকাতা

উৎসর্গ

সুহৃদ্‌বর

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু

করকমলেষু—

২৪শে নভেম্বর,

১৯৩৬।

মুখপত্র

পৃথিবীতে নানা রকম ঘটনা ও দুর্ঘটনা নিত্য ঘটে। তার মধ্যে কতকগুলো বিশেষ ক'রে লোকের চোখে পড়ে, আর সেই সঙ্গে আমাদের মনে নানারূপ ভাবনা চিন্তার উদ্রেক করে।

১৩৪০ বঙ্গাব্দে চোখে পড়বার মতো নানারূপ ঘটনার বিষয় আমি 'উদয়ন' পত্রিকায় আমার মোৎ-ফরক্কা মতামত প্রকাশ করি। সেই পূর্ব্ব লেখাগুলি একত্র করে আমি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করছি।

যখন এ লেখাগুলি প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল, তখন অনেকের কাছে তা গ্রাহ্য হয়েছিল। সুতরাং আশা করি এখন তা অপাঠ্য বলে গণ্য হবে না। বিশেষতঃ যে সব সমস্যার উল্লেখ করেছি, তার একটিও যখন আজ পর্য্যন্ত মীমাংসিত হয়নি।

এ সমালোচনাগুলির "ঘরে বাইরে" নাম আমি দিইনি, দিয়েছিলেন 'উদয়ন' পত্রিকার সম্পাদক। আমি ও-নামে আপত্তি করিনি। কারণ যে সব কথা আমি বলেছি, সে সব ঘরেরও কথা বাইরেরও কথা।

এ পুস্তিকার প্রুফ দেখে দিয়েছেন আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি। এর জন্য তাঁর নিকট আমি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

ঘরে বাইরে



প্রথম প্রস্তাব

(১)

আমরা যাকে ঘরের কথা বলি, তা' যে কতটা ঘরের, কতটা বাইরের, তা' বলা কঠিন। কারণ আমাদের মন স্থধু ঘরেই থাকে না, বাইরেও থাকে। নিত্য বাইরের পাঁচরকম জিনিষ আমাদের মনে প্রবেশ করে ও মনকে ধাক্কা দেয় ; এবং তার ফলে আমাদের অন্তরে নূতন ভাব, নূতন চিন্তার উদয় হয়। বাইরের অধীনতা থেকে আমাদের কারও মন মুক্ত নয়। বরং সত্যকথা এই যে, বাইরের সঙ্গে সম্পর্কহীন মন বলে কোনও পদার্থ আছে কি না, তা' আময়া জানিনে,—হয়ত যোগীরা জানেন।

(২)

বিশেষতঃ এ-যুগে সংবাদপত্র ও রেডিও প্রভৃতির প্রসাদে বাইরের সঙ্গে আমাদের মনের সম্পর্ক ঢের বেশি ব্যাপক হয়ে পড়েছে। পৃথিবীতে কোথায় কি ব্যাপার ঘটেছে, তা' আমাদের না জেনে উপায় নেই। এর ফলে আমাদের আত্মজ্ঞান বাড়ুক আর না বাড়ুক, আমাদের বাহ্যজ্ঞান ক্রমেই বেড়ে চলেছে। পৃথিবীতে কোথায় কি ঘটনা হচ্ছে, কে কি করছেন, কে কি বলছেন, সে খবর আমরা নিত্য পাই। এবং এ-সব খবরে আমাদের মন নিত্য উত্তেজিত হয়, ব্যতিব্যস্ত হয়, বিক্ষিপ্ত হয়। আর এইরূপ দৈনিক উত্তেজনা আমাদের একরকম নেশার মধ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ-জাতীয় খবরাখবরের মৌতাত আমাদের প্রতি-সকালে হয়, আর চায়ের মৌতাতের চাইতে খবরের কাগজের মৌতাত এক বিন্দুও কম নয়; ফলে বাইরের কথা একালে একরকম ঘরের কথা হয়ে উঠেছে।

(৩)

এক কাল ছিল যখন বাঙালীর কাছে "ঘর হতে আঙ্গিনা বিদেশ" ছিল। আর এ-যুগে প্রায় সমগ্র পৃথিবী, অর্থাৎ বিলকুল বিদেশ, আমাদের ঘরের আঙ্গিনা হয়ে উঠেছে। আমাদের ঘরের সঙ্গে বাইরের, দেশের সঙ্গে বিদেশের সম্পর্ক অতি নিকট হয়ে উঠেছে। সকালবেলায় খবরের কাগজ খুলেই দেশ-বিদেশের কথা আমাদের চোখে পড়ে, আর আমাদের মনটা সমস্ত

পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে। আর এই সব বাইরের কথার সঙ্গে ঘরের কথার কি যোগাযোগ আছে, তা' আমরা ভাবতে বাধ্য হই ;—কারণ যোগাযোগ যে আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। খবরের কাগজে প্রকাশ যে, আমেরিকা Dundee থেকে দেদার পাট কিনেছে। এর ফলে যে বাঙলায় পাটের বাজার চড়ে যাবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়। ফলে, বাঙলার বর্ত্তমান দৈন্য যে কতক পরিমাণে ঘুচবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কারণ বাঙলাদেশের টাকা হচ্চে পাট। আর পাট সস্তা হলেই বাঙলায় টাকার দুর্ভিক্ষ হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে ঘরের কথা ও বাইরের কথা অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে গেছে, কারণ ঘর এখন নানা বিষয়ে বাইরের একান্ত অধীন হয়ে পড়েছে। এ-যুগে কোন জাতির পক্ষে সম্পূর্ণ আত্ম-বশ হওয়া অসম্ভব। অথচ প্রতি জাতিই যখন আত্মোন্নতির কথাই ভাবেন তখন ঘরের উন্নতির কথাই ভাবেন—পরের উন্নতির কথা নয়। এর ফলেই এ-যুগে জাতিতে জাতিতে যত বিরোধের সৃষ্টি হয়।

(৪)

এই আন্তর্জ্জাতিক বিরোধ ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পৃথিবীময় economic war-এর সৃষ্টি করেছে। আর পৃথিবীর বহু বড় বড় অর্থ-শাস্ত্রীর মতে মানুষের বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট প্রধানতঃ এই economic war-এরই অবশ্যম্ভাবী ফল। এই কারণে

Roosevelt যে আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন, এ-ঘটনা বাইরের একটী বড় ঘটনা। Roosevelt পৃথিবীর এই economic war-এর পরিবর্ত্তে শান্তিস্থাপন করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন ; এবং কতক পরিমাণে তিনি যে তাঁর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবেন, এরূপ আশা করা অসঙ্গত নয়। আমেরিকার প্রেসিডেণ্টকে এক হিসাবে Dictator বলা যেতে পারে, কারণ ডিক্টেটরের অনেক ক্ষমতা তাঁর আছে। যুদ্ধঋণে পৃথিবীর অনেক দেশ এখন বিষম ভারাক্রান্ত, এবং আমেরিকাই হচ্ছে সে সব দেশের প্রধান উত্তমর্ণ। সুতরাং তিনি যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে য়ুরোপের ঋণভার অনেকটা লাঘব করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি নিজের দেশের অর্থসঙ্কট দূর করবার জন্য gold standard বর্জ্জন করেছেন। অর্থাৎ কিছুদিন পূর্ব্বে ইংলণ্ড আত্মরক্ষার জন্য যে পন্থা অবলম্বন করেছিল, আমেরিকাও আজ সেই পথের পথিক। উপরন্তু Roosevelt আমেরিকায় টাকা সস্তা করবার উপায় অবলম্বন করেছেন। ইংরাজীতে যাকে বলে টাকার Inflation, আমেরিকার গভর্ণমেণ্ট নির্ভয়ে তারই শরণাপন্ন হয়েছেন। দেশে টাকার পরিমাণ বাড়লে যে জিনিষ-পত্রের দাম বাড়বে, সে কথা বলাই বাহুল্য। টাকার অভাব ঘটলেই টাকার মূল্য ঢের বেড়ে যায়। অর্থাৎ দু'টাকার জিনিষ এক টাকায় কেনা যায়। Inflation-এর ফলে দেশের সেই অল্পসংখ্যক লোকের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হয়, যারা তাদের টাকার একটা বাঁধা উপসত্ত্ব ভোগ করে, যথা টাকার সুদ ইত্যাদি। বাদবাকি

সকলের এই ব্যাপারে লাভ বই লোকসান নেই। ভবিষ্যতে দেখা যাবে এর ফল কি হয়।

(৫)

পৃথিবীর আর একটা বড় ঘটনা হচ্ছে—Hitler-এর জার্ম্মানির হর্ত্তাকর্ত্তাবিধাতা হওয়া। কারণ তাঁর কথাবার্ত্তায় বোঝা যায় যে, তিনি পৃথিবীর পোলিটিকাল শান্তিভঙ্গ করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছেন। জার্ম্মানি গত যুদ্ধের ফলে একটি অধঃপতিত জাত হয়ে পড়েছে। Hitler আবার জার্ম্মানিকে আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে ব্রতী হয়েছেন। ফ্রান্স ভয় পায় যে, Hitler যে উপায়ে জার্ম্মানিকে আবার আত্মপ্রতিষ্ঠ করতে চান, তা' ফ্রান্সের আত্মরক্ষার অন্তরায়। ইংলণ্ড ভয় পায় যে, সে দেশের রাজমন্ত্রীরা য়ুরোপের জাতিতে জাতিতে যে আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব করেছেন, Hitler তাঁদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করবেন। Roosevelt যেমন economic war বন্ধ করতে চেষ্টা করছেন, Hitler আবার নূতন political war বাধাবার চেষ্টা করছেন। পৃথিবীতে economic শান্তি অথবা political যুদ্ধ, যাই ঘটুক, তার সুফল ও কুফল আমরা ভারতবাসীরাও ভোগ করব। অথচ এই শান্তিস্থাপন অথবা যুদ্ধসংঘটনের উপর আমাদের কোনই হাত নেই। আমরা ধনেপ্রাণে সম্পূর্ণ পরবশ। সুতরাং বিদেশের এই সব বড় বড় কথা দু'দিন বাদে আমাদের ঘরের কথা হয়ে উঠবে। এই কারণেই পূর্ব্বে বলেছি যে, এ-যুগে বাইরের

কথা আমাদের ঘরের কথা হ'য়ে উঠেছে। ভবিষ্যৎ চিরকালই মানুষের আশা ও ভয়ের দেশ। গত শতাব্দীতে ভবিষ্যৎ প্রধানতঃ আশার দেশ ছিল; বর্ত্তমানে তা' হয়ে উঠেছে প্রধানতঃ ভয়ের দেশ। এর কারণ, গত শতাব্দী ছিল মুখ্যতঃ পৃথিবীর আর্থিক প্রগতির যুগ; আর বর্ত্তমান হয়েছে স্পষ্টতঃ আর্থিক দুর্গতির যুগ। কিন্তু এই আর্থিক দুর্গতিকে প্রগতিতে পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের হাত কম, বাইরের হাত বেশি।

(৬)

এখন ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক্। ভারতবর্ষে সম্প্রতি সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হচ্ছে মহাত্মা গান্ধীর অনশন-ব্রত। এ-ব্যাপারে দেশসুদ্ধ লোক যে কতদূর চমৎকৃত, উত্তেজিত এবং উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিল, সে কথা বলাই বাহুল্য। বহুলোক মনে করেন যে, মহাত্মা গান্ধীর কার্য্যকলাপের উপর দেশের ভাগ্য অনেকটা নির্ভর করছে। এই কারণে, দেশের লোকের কাছে তাঁর জীবন সর্ব্বাপেক্ষা বহুমূল্য। এই বহুমূল্য জীবন তিনি হেলায় বিসর্জ্জন করতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন,—এতে যে দেশের লোকে যুগপৎ ভীত ও বিস্মিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে মনে হয় যে, মহাত্মা গান্ধী কোন ভীষণ রোগে আক্রান্ত হলে, তার পরিণামের জন্য দেশের লোক এতটা উতলা হয়ে উঠত না। মহাত্মা যা' বরণ করেছিলেন, সে হচ্ছে স্বেচ্ছামৃত্যু, এবং তার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তাঁর এ-প্রায়োপবেশনরূপ কঠোর সঙ্কল্পের মূলে ছিল

'হরিজন'দের অস্পৃশ্যতা হিন্দুসমাজ থেকে দূর করবার একান্ত আকাঙ্ক্ষা। হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতারূপ পাপের তিনি প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। বোধহয় তাঁর আশা ছিল যে, তাঁর প্রায়শ্চিত্তের ফলে হিন্দুসমাজ এ-পাপ হতে মুক্ত হবে। তিনি যে প্রায়শ্চিত্তের ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা অক্ষত শরীরে উত্তীর্ণ হয়েছেন, এতে দেশের লোক হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এ-অনশনব্রত পালন ক'রে তিনি আবার প্রমাণ করেছেন যে, তিনি দেহে ও মনে একজন অসাধারণ পুরুষ। যারা মহাত্মার শিষ্যও নয়, অনুরক্ত ভক্তও নয়, তারাও স্বীকার করতে বাধ্য যে, তাদের তুলনায় তিনি একজন super-man। Superman মাত্রই সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। মহাত্মার জনৈক সহচর ও অনুচর বলেছেন যে, তিনি একজন mystery-man; এ-কথা সত্য। কারণ আমরা সেই ব্যাপারকে mystery বলি, যার কার্য্য-কারণ আমরা আমাদের সহজ মন দিয়ে স্পষ্ট বুঝতে পারিনে, অথচ যার শক্তিও আমরা অস্বীকার করতে পারিনে।

(৭)

এখন মহাত্মার অনুষ্ঠিত ব্রতের ফল কি হবে, তা' অনুমান করতে চেষ্টা করা যাক।

প্রথমতঃ, মহাত্মার ডাক্তারবন্ধুদের মতে তিনি এই প্রমাণ করেছেন যে, তাঁর মন তাঁর দেহের উপরে জয়লাভ করেছে। মানুষের মন তার দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, এবং মনের শক্তি যে

দেহকে অনেক পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করে, এ-সত্য বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সম্মত। কিন্তু মহাত্মা এই বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রমাণ করবার জন্য অনশনব্রত গ্রহণ করেননি। যে উদ্দেশ্যে তিনি এই ভীষণ ব্রত অবলম্বন করেছিলেন, সে উদ্দেশ্য তাঁর প্রায়োপবেশনের ফলে কতটা সিদ্ধ হবে, তাই হচ্ছে আসল বিচার্য্য।

মহাত্মার এই প্রায়শ্চিত্তের ফলে হিন্দুসমাজও যে অনু-প্রায়শ্চিত্ত করবে, এরূপ আশা করা অসঙ্গত ; এবং হরিজন-সমস্যা যে তার চূড়ান্ত সমাধানের পথে বেশি দূর এগোবে, এমনও মনে হয়না। মহাত্মা গান্ধী ১৩।১৪ বৎসর পূর্ব্বে অস্পৃশ্যতা-বর্জ্জনের প্রস্তাব উথাপন করেন। কিন্তু এই এক যুগের আন্দোলনের ফলে হরিজনরা কি হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ?—ধরুন এই বাঙলার কথা। এ-অঞ্চলে অস্পৃশ্যতার কোন বাড়াবাড়ি নেই। এর প্রথম কারণ, বাঙলাদেশে অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর লোক অস্পৃশ্য বলে গণ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ, বাঙলার উচ্চশ্রেণীর অধিকাংশ লোক ইংরাজীশিক্ষিত। ফলে, তাঁরা মানুষকে স্পর্শ করা অধর্ম্ম বলে বিবেচনা করেন না। অথচ আমরা জাতিভেদের গণ্ডির ভিতর বাস করি বলে, সে গণ্ডি লঙ্ঘন করতে প্রস্তুত নই। মনে আমরা অধিকাংশ লোক অস্পৃশ্যতা মানিনে, কিন্তু আমাদের হালচালব্যবহার পূর্ব্বের মতই রয়ে গেছে, বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয়নি। কেবলমাত্র বর্ত্তমান যুগে যে-যে স্থলে জীবনযাত্রার জন্য আমরা সেকেলে বন্ধন ঢিলে দিতে বাধ্য হয়েছি, সেই সব স্থলে আমরা ব্যক্তিগতভাবে সুবিধার

খাতিরে কতকটা মুক্তিলাভ করেছি—সামাজিকভাবে নয়। আমাদের জীবনে ও মনে যে মিল নেই, এ-কথা ত সর্ব্বজনবিদিত।

(৮)

আসল কথা এই যে, হিন্দুসমাজে জাতিভেদ প্রথা রক্ষা করে হিন্দুনামধারী সকল লোককে একজাতিতে পরিণত করা অসম্ভব। কারণ, জাতিভেদ-প্রথার অর্থই হচ্ছে উচ্চনীচের প্রভেদ। মানুষমাত্রকেই মানুষ হিসেবে গণ্য করা সামাজিক হিন্দুর পক্ষে সহজ নয়। আর আমাদের এই যুগসঞ্চিত সংস্কার ও অভ্যাস একদিনে দূর করা সম্ভব নয়। হিন্দুসমাজ এক নয়,—অসংখ্য ভগ্নাংশের সমষ্টিমাত্র। এই ভগ্নাংশগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা আমাদের পক্ষে পোলিটিকাল হিসেবে নিতান্ত কাম্য হয়ে উঠেছে; তাই আমাদের পোলিটিকাল নেতারা পুণা-প্যাক্ট প্রভৃতির দ্বারা সে পোলিটিকাল যোগসাধন করবার চেষ্টা করছেন। বলা বাহুল্য, এ-যোগ সামাজিক যোগ নয়। ইলেক্‌শানের ক্ষেত্রে সমাজগঠন করা যায় না। এই উচ্চনীচের অসম্ভব প্রভেদ হিন্দু-সমাজের শুধু পাপ নয়, তার দুর্ব্বলতারও মূল। যতদিন এই ভেদবুদ্ধিকে আমরা আঁক্‌ড়ে ধরে থাকব, ততদিন আমরা জাতকে জাত দুর্ব্বল থেকে ক্রমে দুর্ব্বলতর হব। যে সমাজ আজ দু'হাজার বৎসর ধরে গড়ে উঠেছে, তার হঠাৎ-পরিবর্ত্তন কি করে সম্ভব হতে পারে, তা' বুঝতে পারিনে। অথচ এ পরিবর্ত্তন যে নিতান্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এ-অবস্থায়

দেশের ভদ্রসম্প্রদায় মহাত্মা গান্ধীর মতের সঙ্গে মনে মনে সায় দেবেন; কিন্তু জীবনে তাঁর মতের অনুগামী হবেন না, বা হতে পারবেন না। মহাত্মা গান্ধীর প্রয়োপবেশনের বিষয় দেশে দেদার লেখাপড়া ও বলা-কওয়া হচ্ছে; কিন্তু কি উপায়ে যে তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করা যায়, সে বিষয় বড় কিছু আলোচনা শোনা যায় না। বরং মহাত্মা গান্ধী পোলিটিকাল ক্ষেত্রে শান্তি-স্থাপন করবেন, কি অশান্তির সৃষ্টি করবেন, এই নিয়ে পোলিটি-কাল দল ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

(৯)

হরিজন উদ্ধারের অন্তরায় সনাতনপন্থীর দল নয়। কারণ এ-দল স্বল্পসংখ্যক, উপরন্তু এ-যুগের যা' প্রধান শক্তি—শিক্ষালব্ধ জ্ঞান ও বুদ্ধি—সে শক্তিতে তারা বঞ্চিত। সুতরাং শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি আমাদের সামাজিক গঠনের পরিবর্ত্তন সাধনে যথার্থ ব্রতী হন, তাহলে সনাতনপন্থীদের দত্ত বাধা তাঁরা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারেন। ইংরাজী শিক্ষার ফলে আমরা বহু নূতন আইডিয়াল লাভ করেছি। কিন্তু সেগুলিকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করবার সাহস ও চরিত্রবল অর্জ্জন করিনি। অনেক সময় মনে হয় যে, শিক্ষিত লোকের এ-সব আইডিয়ালের সার্থকতা আছে একমাত্র বক্তৃতার ক্ষেত্রে—কর্ম্মক্ষেত্রে নয়। একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় যে, সনাতনপন্থীরা যে-সব কথা মুখ ফুটে বলছেন, সে-সব কথা অনেকটা আমাদেয় শিক্ষিত দলেরই গোপন

মনের কথা। কথায় মনের যে অংশটুকু প্রকাশ পায়, সেইখানেই আমাদের ও সনাতনপন্থীদের মনের অনৈক্য আছে। কিন্তু যে মন জীবনের রূপ দান করে, সে মনে বাদবাকি লোকের সঙ্গে শিক্ষিত লোকের মনের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। কোন সামাজিক প্রথার উপর আমরা হস্তক্ষেপ করতে ভয় পাই, কারণ আমরা আশঙ্কা করি উক্ত পরিবর্ত্তনের ফলে সমাজ বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে। এবং কোন নতুন সমাজ গড়বার শক্তি যে আমাদের আছে, সে বিষয়ে আমাদের কোন ভরসা নেই। হরিজনদের উদ্ধার করবার পূর্ব্বে আমাদের নিজেদের মনকে এই সামাজিক জড়তা থেকে উদ্ধার করতে হবে। [আষাঢ় ১৩৪০]

দ্বিতীয় প্রস্তাব

(১)

আজকের দিনে কি-ঘরের কি-বাইরের বিষয়ে লিখতে বসলেই, বীরবলের কলম ধরবার লোভ হয়। আজকের দিনে যা বড় ঘটনা ঘটে, তার ইংরাজী নাম হচ্ছে Conference। আর Conference ব্যাপারই হচ্ছে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া। আজ এক যুগ ধরে যে League of Nations-এর বৈঠক বসছে, তার ফলে আর যাই হোক, জাতিতে জাতিতে কোনও সন্ধি হয় নি। আর, সম্প্রতি বিলেতে যে Economic Conference বসেছে, তাও যে দুদিনে ফেঁসে যাবে, তার সব লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; যদি না ইতিমধ্যেই তা ফেঁসে গিয়ে থাকে।

Conference-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে পাঁচজনে তর্ক করে একমত হওয়া। কিন্তু যেখানে পাঁচজনের মনের মিল নেই এবং কেউ কারও কথায় বিশ্বাস করে না, এবং সকলে ঠকবার ভয়েই অস্থির,—সেখানে পাঁচজনের পক্ষে একমত হওয়া অসম্ভব। অথচ সকলেই যখন বোঝে যে, পৃথিবীর জাতিমাত্রেই এইরকম পরস্পর রেষারেষির ফলে নিতান্ত দুরবস্থায় পড়েছে, তখন পরস্পরের সঙ্গে সলা-পরামর্শ করে এই আন্তর্জ্জাতিক Economic War-এর একটা আপোষ-মীমাংসা করবার প্রবৃত্তিও অতি স্বাভাবিক। এই জন্যই ইউরোপে আজকাল নানারকম Con-

ference বসে ; এবং সেখানে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মনের ও মতের অমিল প্রচার করেই, যে যার স্বস্থানে সরে' পড়ে। এ ক্ষেত্রে বীরবলের প্রকৃতির লোক ব্যাপার দেখে হেসে উঠবেন, কারণ তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের চর্চ্চা, অর্থাৎ ফলনিরপেক্ষ বলা-কওয়ার অর্থ বোঝেন না। আমি কিন্তু এই সব Conference-এর ব্যর্থতাকে হাসির জিনিষ মনে করিনে, কান্নার জিনিষও মনে করিনে।

(২)

শুনতে পাই বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীক দার্শনিক Plato বলে গিয়েছেন যে, সভ্যতার অর্থই হচ্ছে Force-এর উপর Persuasion-এর জয়। এ কথা সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রাহ্য করি, কারণ অগ্রাহ্য করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। মানবসমাজে সভ্যতা বলে যদি কোনও পদার্থ থাকে, আর মানবসমাজে ইভলিউসান বলে যদি কোন ধর্ম্ম থাকে ত, সভ্যসমাজের ইভলিউসানের ইতিহাস Platoর মতই প্রমাণ করে। এ মত গ্রাহ্য করতে অনেকে যে ইতস্ততঃ করবেন, তার কারণ বলপ্রয়োগের ফল যতটা প্রত্যক্ষ, Persuasion-এর ফল আমাদের চর্ম্মচক্ষুর কাছে ততটা প্রত্যক্ষ নয়। বিশেষতঃ এ দেশে আমাদের যখন মারাত্মক বল নেই, তখন আমরা কল্পনায় বলকে খুব বড় করে দেখি। Conference যে কোনও সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে না, তা আমরা নিত্যই দেখতে পাই ; কিন্তু Force-ই কি

কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা করতে পারে?—ইউরোপের গত যুদ্ধের মত বিরাট যুদ্ধ বোধহয় পৃথিবীতে ইতিপূর্ব্বে কখন হয়নি। এর তুলনায় কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকেও Football Match-এর পর্য্যায়ে ফেলা যেতে পারে। কিন্তু গতযুদ্ধ কি কোন মানব সমস্যার মীমাংসা করেছে, না নানা নতুন সমস্যার সৃষ্টি করেছে? অপর কথা ছেড়ে দিলেও, পৃথিবীর বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি কি গতযুদ্ধের অনিবার্য্য ফল নয়? আর বর্ত্তমান Economic Conference কি গতযুদ্ধরূপ পাপের শাস্তি থেকে উদ্ধার পাবার উপায়ের সন্ধান পাবার চেষ্টা নয়? এক হিসেবে তর্কযুদ্ধের অপেক্ষা অস্ত্রযুদ্ধ আমাদের মনোমত। যুদ্ধের কথা থাকলে সংবাদপত্র সুপাঠ্য হয়ে ওঠে, আর ইকনমিক্সের তর্কে তা আমাদের অধিকাংশ পাঠকের কাছে অপাঠ্য হয়ে পড়ে।

(৩)

এর কারণ, নিরীহ লোকে খুন-জখম করতে ভাল না বাসুক, খুন-জখমের কথা শুনতে ও তার অভিনয় দেখতে ভালবাসে।

গড়ের মাঠে নিত্যই দেখা যায় যে, Football Match দেখতে হাজার হাজার লোক উপস্থিত হয়, আর ম্যাচ নামক নকল যুদ্ধ দেখে তাদের কি উৎসাহ, কি আনন্দ হয়! এ আনন্দের কারণ, এ খেলাতে হাতাহাতি আছে, লাথালাথি আছে, আর খুন না হোক জখম আছে।

তারপর সিনেমার এত পসার কেন?—সিনেমাতে চামড়ার

গোলা নিয়ে নয়, রক্তমাংসের রমণীর কায়া নিয়ে না হোক, ছায়া নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারি আছে ; অন্ততঃ দুদিন আগেও ছিল। আর এর দর্শকের দল আবালবৃদ্ধবনিতা, ছোট-লোক, বড়-লোক সবাই। অপরপক্ষে, ইকনমিক্স্ সম্বন্ধে বক্তৃতা শোনবার নিমন্ত্রণ আমরা ক'জন রক্ষা করি ? যদিও ইকনমিক্সের ক্ষেত্রে হার-জিতের উপর আমাদের জাতির জীবন-মরণ নির্ভর করে। আর অপর দুই ক্ষেত্রে হার-জিতের ফলে কারও কিছু আসে যায় না।

ইকনমিক্সের বিধি-নিষেধ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন, কেননা সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এ বিষয়ে কিছু জানবার আমাদের কৌতূহল পর্য্যন্ত নেই। ফলে, খবরের কাগজের সেন্টিমেন্টাল ইকনমিক্সের বুলিগুলো আমরা মুখস্থ করেই সন্তুষ্ট থাকি। কিছু-দিন থেকে আমরা দরিদ্র-নারায়ণের মহা ভক্ত হয়ে পড়েছি, অন্ততঃ মুখে। এর একটী কারণ—ও মনগড়া নারায়ণের পূজায় ভোগ দিতে হয় না। তা' যদি দিতে হত, তাহলে দরিদ্র আমাদের কাছে নারায়ণ না হয়ে রাক্ষস হয়ে উঠত ; যেমন ইংলণ্ডে dole-এর কৃপায় ধনী সম্প্রদায়ের কাছে তারা হয়ে উঠেছে।

(৪)

ইকনমিক্স্ সম্বন্ধে আমাদের এ অজ্ঞতা, এ ঔদাসীন্যের অনেক কারণ আছে। তার ভিতর একটি স্পষ্ট কারণ এই যে, বঙ্গসাহিত্যে আজ পর্য্যন্ত ইকনমিক্সের স্থান নেই। বাঙলা যে আমরা ইংরেজীর চাইতে ভাল বুঝি, আর ঢের সহজে বুঝি, সে

বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং ইকনমিক্স্ শাস্ত্রের যদি বাঙলা ভাষায় প্রচার হত, তাহলে এ বিষয়ে কোনরূপ মত দেবার অধিকার আমাদের না জন্মালেও, ইকনমিক্স্-শাস্ত্রীদের মতামত বোঝবার অধিকার আমরা লাভ করতুম। ইংরাজিতে যাকে Science বলে, তার সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ লোকের জ্ঞান কি এই জাতীয় নয়? আজকের দিনে পৃথিবী যে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, এ সত্য আমরা সকলেই মানি; কিন্তু কি প্রমাণের ফলে এ সত্য আমরা মানতে বাধ্য, তা' কি আমরা সকলেই জানি?

অবশ্য ইকনমিক্স্ ফিজিক্সের তুল্য Science নয়; তবে ধনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের যে কতকগুলি মোটা নিয়ম আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। অধ্যাপকরা যদি বাঙলায় কথা কইতেন, ত আমরা সাধারণ লোকে ইকনমিক্সের কতকগুলি সাধারণ নিয়মের সঙ্গে পরিচিত থাকতুম। তাঁরা যে তা' করেন না, তার কারণ তাঁরা অধ্যাপনা করেন ইংরেজী ভাষায়। তার থেকে হয়ত তাঁদের ধারণা জন্মেছে যে, ও শাস্ত্র-বচন বাঙলা ভাষায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে না। কারণ পারিভাষিক শব্দে বাঙলা ভাষা দরিদ্র। কিন্তু পরিভাষা বাদ দিয়েও যে ইকনমিক্স্-শাস্ত্র বোঝানো যায়, এ জ্ঞান বোধহয় অধ্যাপকদের নেই। আর এ শাস্ত্রের পরিভাষা যে নানা লোকে নানা অর্থে বোঝেন, অথবা বোঝেন না, তার বহু প্রমাণ আছে। অতএব পরিভাষারূপ জুজুকে ভয় করবার কোন প্রয়োজন নেই।

(৫)

বিলেতি অর্থশাস্ত্রও যে বাঙলা ভাষায়, অর্থাৎ যে ভাষায় আমরা লিখি আর পাঁচজনে পড়ে, সেই পরিচিত ভাষাতেই পরিষ্কার করে লেখা যায়, আমি সম্প্রতি তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ও ইকনমিক্স্ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র সিংহ গত প্রবাসী-সাহিত্য-সম্মেলনের ইকনমিক-শাখার সভাপতি হিসেবে যে অভিভাষণ পাঠ করেছেন, সে অভিভাষণের ভাষা ইংরাজী নয়—বাঙলা; তাও আবার সাধু বাঙলা নয়, চল্‌তি বাঙলা। উক্ত প্রবন্ধ যে কত সরল ও সহজবোধ্য, তা যাঁর ইচ্ছা তিনি পড়ে দেখতে পারেন।

আর গত মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায় শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন নামক কোনও নূতন লেখক স্বর্ণমান সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। প্রথমতঃ তিনি যে ভাষায় লিখেছেন, তা' বাঙলা; কারণ প্রবন্ধটি বিনা আয়াসে আদ্যোপান্ত এক নিঃশ্বাসে পড়া যায়।

Gold-Standard ইকনমিক্সের একটি জটিল সমস্যা। এ বিষয় ইকনমিক্সের নানা মুনির নানা মত। শুধু তাই নয়, নানা গভর্ণমেণ্টেরও নানা ব্যবহার। কেউ Gold-Standard আঁকড়ে ধরে আছেন, কেউ বা তা' প্রত্যাখ্যান করেছেন। সে যাই হোক, Gold-Standard-এর পক্ষে কি বলবার আছে, শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন তা' অতি সহজ ভাষায়, অতি বিশদ ভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন। পরিভাষার সাহায্য তাঁকে

একরকম নিতেই হয় নি। পরিভাষার অনেক গুণ থাকতে পারে, কিন্তু তার মহা দোষ হচ্ছে এই যে, অনেক শাস্ত্রী ঐ পরিভাষাকেই শাস্ত্র বলে ভুল করেন। তখন এই শাস্ত্রের পণ্ডিতে পণ্ডিতে বোঝাপড়া হতে পারে, কিন্তু আমাদের পক্ষে তা' সম্ভব নয়।

(৬)

এখন ইকনমিক Conference-এর আলোচনায় ফিরে আসা যাক।

এ শাস্ত্রের শাস্ত্রীরা বহুকাল পূর্ব্বে আবিষ্কার করেছেন যে, বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট শুধু আমাদের কিম্বা তোমাদেরই ঘটেনি, তা'দেরও ঘটেছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে এমন কোনও দেশ নেই, যে দেশ অর্থের অভাবে বিপন্ন নয়।

ফলে কোন দেশই নিজের চেষ্টায় এ দুর্গতি থেকে উদ্ধার পাবে না। কারণ প্রতি জাতির স্বার্থপরতা এ দুর্গতির অন্যতম কারণ। সুতরাং সকল জাতির একত্র হয়ে মিলেমিশে পরামর্শ করে, এ বিপদ কাটিয়ে ওঠবার উপায় স্থির করতে হবে।

এই কারণেই এই ইকনমিক Conference-এর বৈঠক বসেছে। পৃথিবীর এই আর্থিক দুর্দ্দশা প্রধানতঃ গত যুদ্ধের ফল। এ যুদ্ধের চারটি প্রত্যক্ষ ফল আছে—(১) Reparation বা ক্ষতিপূরণ, (২) যুদ্ধঋণ, (৩) শুল্কবৃদ্ধির দ্বারা আমদানি-রোধ, (৪) টাকার মূল্যের অস্থিরতা।

এই Conferenceএ Ramsay Macdonald ও Chamberlain-এর কথায় বুঝেছিলুম যে, শুল্কের হার কমানো, যুদ্ধঋণ থেকে অধমর্ণ জাতিদের নিষ্কৃতি দেওয়া, ও নানা দেশের টাকার একটা বাঁধাধরা মূল্য স্থির করবার জন্যই এ Conference-এর প্রয়োজন। ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট যখন ইতিপূর্ব্বে এ বিষয় গোপনে পরামর্শ করেছিলেন, তখন অনুমান করেছিলুম যে, তাঁরা দুজনে একমত হয়েছেন।

(৭)

এ Conferenceএ কিন্তু Reparation-এর কথা ওঠেনি, সম্ভবতঃ এই কারণে যে, ক্ষতিপূরণের প্রধান দেনদার জার্ম্মানী, ও পাওনাদার ফ্রান্স; আর ইতিপূর্ব্বেই আমেরিকার মধ্যস্থতায় সে দেনা-পাওনা মূলতবি রাখা হয়েছে। অর্থাৎ ফ্রান্সের ডিক্রী বজায় আছে, কিন্তু সে ডিক্রীর জারি স্থগিত রাখা হয়েছে।

তারপর যুদ্ধঋণ যেখানে ছিল, সেখানেই রয়ে গিয়েছে। আমেরিকা ইংলণ্ডকে যে টাকা ধার দিয়েছে, সে টাকা সে ছাড়বে না। ইংলণ্ড এ ক্ষেত্রে আংশিক সুদ আদায় দিয়ে তামাদি রক্ষা করেছে। শুধু ইংলণ্ড এবার সোনার বদলে রূপো দিয়েছে।

এত রূপো ইংলণ্ড পেলে কোত্থেকে?—ভারতবর্ষের কাছ থেকে। ভারত-গভর্ণমেণ্টের তহবিলে অনেক রূপো মজুত ছিল, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট সেই রূপো কিনে তাই দিয়ে এ কিস্তির আংশিক টাকা দিয়েছেন!

শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার বলেন যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আমাদের গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে সস্তায় রূপো কিনে, চড়া দামে আমেরিকায় তা চালান দিয়েছেন। ফলে ভারতবর্ষের এক ক্রোর টাকা লোকসান হয়েছে। সরকার মহাশয়ের কথার গভর্ণমেণ্ট কোনও প্রতিবাদ করেন নি। এর কারণ নাকি এই যে, কোন প্রতিবাদ করার প্রয়োজন নেই। একটি ইংরাজী সংবাদপত্র এই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ ব্যাপারে ইংলণ্ড লাভবান হতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। ইকনমিক্‌স্ শাস্ত্রে যাঁদের অন্তর্দৃষ্টি আছে, তাঁরা নাকি এ কথা সহজেই বুঝতে পারেন। আমাদের নেই বলেই আমাদের মনে খট্‌কা লাগে।—সে যাই হোক, এই যুদ্ধঋণ বাইরের কথা হলেও যে আমাদের ঘরে কথা, —এই লেনদেনই তার প্রমাণ।

(৮)

গত কিস্তির টাকা ইংলণ্ডকে সোনায় দিতে হয়েছিল। সে সোনাও সরবরাহ করেছে ভারতবর্ষ। এ ক্ষেত্রেও ভারতবর্ষের সহায়তা ব্যতীত ইংলণ্ড তার কিস্তির টাকা দিতে পারত না। ভারতবর্ষ এ ক্ষেত্রে ইংলণ্ডকে তার দায় হতে মুক্ত করেছে; অন্ততঃ Keynes, Slater প্রভৃতি ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য ইকনমিক-শাস্ত্রীদের মত তাই।

অনেকের বিশ্বাস, কোটি কোটি টাকার সোনা রপ্তানি করা আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। গভর্ণমেণ্ট বলেন, তা' নয়।

এখন এ-ক্ষেত্রে কার কথা ঠিক বলা কঠিন। তবে এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে, পৃথিবীর বহু জাতি আইনের দ্বারা সোনা রপ্তানি বন্ধ করেছে; ব্যাপারটা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, এই বিশ্বাসে। শুধু ভারতবর্ষের সোনা রপ্তানির পথ খোলা। এর থেকে এই প্রমাণ হয় যে, অপর জাতির পক্ষে যা ক্ষতিকর, ভারতবর্ষের পক্ষে তা' লাভজনক।

সে যাই হোক, এই সোনার বিনিময়ে ভারতবর্ষ কি পেয়েছে? —অবশ্য সোনা নয়, রূপো নয়, তামা ত নয়ই; অতএব ধরে নিতে হবে যে, ভারতবর্ষ সোনার বদলে কাগজ পেয়েছে—যাকে ইংরাজীতে বলে note। এ সব বিলেতি নোটের বাজারে কাটতি নেই। অতএব এ সব বিলেতি নোট বদলে স্বর্ণবিক্রেতারা দেশী নোট নিয়েছেন। অবশ্য নোটও টাকা; তবে এই কোটি কোটি টাকার নোটের দৌলতে, ভারতবর্ষের টাকার বাজার সস্তা হয়নি। এত নোট যখন বাজারে নেই, তখন গেল কোথায়? সুতরাং বাইরের কেনা-বেচার কারবার আসলে ঘরেরই লাভ-লোকসানের কথা।

(৯)

এই ইকনমিক Conference-এর ফলে কোন জাতিই যুদ্ধ-ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি পায়নি, কোন জাতিরই tariff-এর প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে নি, আর এক দেশের টাকার সঙ্গে অপর দেশের টাকার চিরসম্বন্ধও স্থির হয়নি; আর সম্ভবতঃ হবেও না।

Exchange-এর সমস্যা ইকনমিক্‌সের বিষম কুটিল সমস্যা। ইউরোপের পলিটিক্যাল সঙ্ঘ যে এ সমস্যাকে সরল করতে পারবেন, এরূপ আশা করা বৃথা; কারণ পলিটিসিয়ানরাই এ সমস্যাকে কুটিল করে তুলেছেন।

যে সব জাতি Gold-Standardকে ত্যাগ করেনি, সে সব জাতি বলছে যে, অন্ততঃ পাউণ্ডের সঙ্গে ডলারের বিয়ে দেওয়া হোক; যেমন আমাদের দেশের গভর্ণমেণ্ট টাকার সঙ্গে পাউণ্ডের বিয়ে দিয়ে বসে আছেন। এই অবিচ্ছেদ্য বিবাহের ফল প্রকারান্তরে Gold-Standard বজায় রাখা। আমেরিকা যে এ প্রস্তাবে সম্মত হবে, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কেননা, এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করলে inflation বন্ধ করতে হয়। সুতরাং এ Conferenceএ নানা সমস্যার বিচার হবে, কিন্তু কোন বিষয়েই দশে মিলে এক রায় দেবে না। তৎসত্ত্বেও বলি, এ Conference একেবারে নিরর্থক নয়। অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, পাঁচজনকে একত্র করতে পারলেই সকল গোল মিটে যাবে। সে বিশ্বাস যে ভুল, এ Conference-এর ব্যর্থতাই তা' প্রমাণ করবে। ইকনমিক Nationalism যখন লোকের মনে প্রভুত্ব করছে, তখন এই সব international সঙ্ঘ, national মন নিয়ে international বিষয়ে একমত হতে পারবে না। ইকনমিক্‌সের বিধি-নিষেধ সর্ব্বসাধারণ, কিন্তু পলিটিক্যাল বিধি-নিষেধ বিশেষ করে জাতিগত।

(১০)

এই সময়েই বিলেতে আর একটি বৈঠক বসেছে, ভারত গভর্ণমেণ্টের Constitution নূতন করে গড়বার জন্য। এ গড়নটা যে কি হবে, তা' White Paper-এই প্রকাশ। এই White Paper-এর কি রদ-বদল করা হবে, তারই আজ বিচার চলেছে। উক্ত প্রস্তাবের স্বপক্ষ ও বিপক্ষদের সাক্ষী নেওয়া, উকিলদের বাগ্জাল শোনা হচ্ছে। রায় কি হবে, দুদিন পরেই জানা যাবে।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলেত থেকে লিখেছেন যে, ও খসড়ার বিশেষ কোন বদল হবে না। White Paper-এর বিপক্ষে দু'দল দাঁড়িয়েছেন। বিলেতে Churchill প্রমুখ Conservativeরা, এবং এ-দেশে কংগ্রেসওয়ালারা।

আমাদের দেশের খবরের কাগজ পড়ে' মনে হয়, Churchillপ্রমুখ Conservativeদের এ বিপক্ষতা শুধু বিপক্ষতার কপট অভিনয় ;—আসলে Baldwin ও Churchill একমত।

আমার বিশ্বাস অন্যরূপ। বিলেতে সব দলের পলিটিসিয়ানরা সব বিষয়ে একমত নন।

Baldwin-এর মত যে, তিনি ও তাঁর সহ-মন্ত্রীরা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করেছেন। Churchill-দলের মতে ঐ ব্যবস্থাতেই ভারত গভর্ণমেণ্টের অবস্থার ঘোর পরিবর্ত্তন হবে ; আর সে নূতন অবস্থার নাম ভীষণ দুরবস্থা। কার দুরবস্থা ? দেশের লোকের না ইংরাজের ?—এঁদের মতে উভয়েরই।

কিন্তু Conservative সঙ্ঘে Churchill-এর দল ভোটে

হেরে গেছেন, Baldwin-এর দল জিতেছেন। এর থেকে অনুমান করা যায়, Churchill-এর বিপক্ষতায় White Paper-এর দল বিশেষ বিচলিত হবেন না।

(১১)

এই প্রস্তাবিত নব Constitution-এর গোড়ায় গলদ এই যে, সেটি জাতিভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের ভিতর সামাজিক জাতিভেদ আছে, সেই জাতিভেদ এখন পলিটিক্সে ডবল প্রমোশান পাবে। আমরা আমাদের সামাজিক জাতিভেদ গুণকর্ম্মের ভেদপ্রসূত বলে মনকে প্রবোধ দিতে পারি ;—কিন্তু এই পলিটিক্যাল জাতিভেদ যে গুণকর্ম্মের বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, এমন কথা মুখেও আনবার জো নেই।

ভবিষ্যৎ লাট-কাউনসিলে দেশী রাজারা হবেন এক জাত, মুসলমানরা আর এক জাত, হরিজনরা আর এক জাত, ইংরাজরা আর এক জাত, আর জাতি-হিন্দুরা অর্থাৎ আমরা হব পঞ্চম জাত। আর আমরাই হব সংখ্যায় নগণ্য। জাতি-হিন্দুরা যে অধিকাংশই শিক্ষিত, অর্থাৎ ইংরাজী-শিক্ষিত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আর শিক্ষার যদি কোন ফল থাকে ত জাতি-হিন্দুরাই যে পলিটিক্যাল হিসাবে গুণী, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই ; কিন্তু লাট-দরবারে এ গুণের কোনও মান্য নেই। কার কি ধর্ম্ম, তার উপরই লোকের পলিটিক্যাল কর্তৃত্ব নির্ভর করবে। আমরা যাকে democratic গভর্ণমেণ্ট বলে জানি, তা অবশ্য এ পদ্ধতিতে গড়া নয়।

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বলেন, এ কাঠামোর কোনও বদল হবে না। আর বাঙলার দরবারে আমাদের প্রতিনিধিরা কোণঠাসা হয়ে থাকবে। বাঙলার এ অবস্থা হয়, তা' নাকি বাকী ভারতবর্ষেরও অভিমত। এর কারণ, বাঙালীরা নাকি বাঙলাকেই ভারতবর্ষ বলে গণ্য করে।

(১২)

তারপর White-Paper-এর প্রস্তাবিত Safeguard গুলি সবই বজায় থাকবে। আমাদের ভাবী গভর্ণমেণ্টের দেশী মন্ত্রীদের হাতে যে সমরবিভাগ ও অর্থবিভাগ তুলে দেওয়া হবে না, এ বিষয়ে বিলেতের সকল রাজনৈতিক দলের কর্ত্তাব্যক্তিরা একমত। গভর্ণমেণ্টমাত্রেরই প্রধান বল হচ্ছে অস্ত্রবল ও অর্থবল। এ দুই বল হস্তান্তর করে ইংরেজ সরকার যে সাক্ষীগোপাল হয়ে এখানে বসে থাকবেন, আশা করি এ আশা কেউ করেন নি।

White-Paper-এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক Baldwin সাহেব স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ভারতবর্ষের Fiscal policy দেশী মন্ত্রীদের মতানুযায়ী হবে না। তিনি বলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যের যত Dominions আছে, তাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের যত মতান্তর ও মনান্তর ঘটেছে, সবই এই Fiscal policy নিয়ে। অবশ্য Dominionরা কালক্রমে এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য লাভ করেছে। তা' যে করেছে তার প্রমাণ, বর্ত্তমান Economic Conferenceএ, Canada ইংলণ্ডের সঙ্গে একমত হতে পারছে না। সুতরাং ভারতবর্ষকে বর্ত্তমানে এ বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া অসম্ভব। ধরুন

যদি লাট-কাউন্‌সিলের বড়কর্ত্তারা দেশীলোক হতেন, তাহলে খুব সম্ভবতঃ দেশ থেকে সোনা রপ্তানি বন্ধ করতেন, আর সস্তাদরে রূপোও বিক্রী করতে রাজী হতেন না। ফলে, যুদ্ধঋণের সুদ দিতে ইংলণ্ডকে কি মুস্কিলেই পড়তে হত। এ যুগের যত পলিটিক্যাল সমস্যা, একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যায় সবই আসলে বর্ণচোরা ইকনমিক-সমস্যা।

(১৩)

শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রনাথ সরকার বিলেতে গিয়ে আবিষ্কার করেছেন যে, বাকী ভারতবর্ষের পলিটিসিয়ানরা বাঙালীর প্রতি অনুকূল নন। পূর্ব্বে যাঁরা Round Table Conferenceএ গিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে এই একই কথা শুনেছি। অপর প্রদেশের এই বাঙালী-বিরাগের কারণ কি?

এর কারণ, বাঙলা বহুকাল পূর্ব্বে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেছে, এবং বাঙালীরা নিজেদের ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ জাত বলে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে। অন্য প্রদেশের পলিটিসিয়ানদের মতে, কলিকাতা বৃটিশ-ভারতবর্ষের রাজধানী ছিল বলে বাঙালীরা এতদূর দেমাকে হয়ে উঠেছিল। কলিকাতা রাজধানী হওয়ায় বাঙালী মনের কি বিকার ঘটেছিল, সে কথা এখন থাক।

কিন্তু যে, বাঙালীরা সমগ্র ভারতবর্ষে বুক ফুলিয়ে বেড়াত, তারা যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়—সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

গত শতাব্দীতে, সমগ্র উত্তর-পশ্চিমে ও মধ্যপ্রদেশে যে

বাঙালী অধ্যাপক ও বাঙালী উকিলই প্রভুত্ব করত, সে-কথা অস্বীকার করা চলে না। এবং এই সূত্রেই বাঙালী তার বিদ্যা-বুদ্ধির পরিচয় দেয়।

আমরা যে-সব বাঙালীকে বাঙলার গৌরব মনে করি, তাঁরা যে সকলেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে গড়া লোক, তা' অবশ্য নয়। রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোনকালেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ধার ধারেন নি। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃপায় গণ্যমান্য হয়ে উঠেছিলেন, এ-ত প্রত্যক্ষ সত্য। জাতি হিসেবে বাঙালীর প্রাধান্য তার শিক্ষার উপরেই নির্ভর করত।

(১৪)

বোধহয় এই কারণেই ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে নানা জাতের বিশ্ববিদ্যালয় গজিয়ে উঠেছে। এক হিসেবে এ অতি সুখের কথা। এত বড় বিরাট দেশের উচ্চ শিক্ষা দুটি তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় দিয়ে উঠতে পারে না। ইংরাজীতে একটি কথা আছে— the more the merrier। সুতরাং এ ব্যাপারটা বিশেষ আনন্দের কারণ হত, যদি প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের পিছনে একটি বিষম অর্থসমস্যা না থাকত।

কাগজ খুললেই দেখতে পাই, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় টাকার অভাবে নাকি কাঁদছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের টাকা নেই, কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিক্ষার ঝুলি রাজারাজড়ার দরবারে নিত্য উপস্থিত করা হচ্ছে। এলাহাবাদ University তার

খরচ কুলোতে পারে না; এবং আমার বিশ্বাস—অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও সমবস্থ।

বহুকাল পূর্ব্বে জনৈক ইংরাজ educationist-এর বইয়ে পড়ি যে, প্রতি জাতি তার শিক্ষার coat according to cloth কাটতে বাধ্য। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর যা' গুণ থাক আর না থাক, এ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়ায় আছে জাতীয় ইকনমিক অবস্থা। অর্থাৎ আমাদের কাপড় কম, কিন্তু আমরা মস্ত মস্ত coat কাটতে ব্রতী হয়েছি। আমরা একবার ভেবেই দেখি নে যে, আমাদের জাতির পক্ষে এতটা উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজন আছে কি না। আমরা কি দেশশুদ্ধ লোককে ব্রাহ্মণ করে তুলতে চাই? এত ব্রাহ্মণের ভিক্ষে যোগাবে কে! আমাদের দেশে শিক্ষাবিস্তারের অগাধ অবসর আছে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার তেমন অভাব নেই, যেমন আছে লোক-শিক্ষার। উচ্চ শিক্ষারও অবশ্য প্রয়োজন আছে, কিন্তু সে বহুলোকের জন্য নয়-স্বল্প সংখ্যক লোকের জন্য। কারণ উচ্চ শিক্ষার অর্থ যাই হোক,—তা' যে লোক-শিক্ষা নয়, তা বলাই বাহুল্য। উচ্চ শিক্ষা Compulsory নয়, Freeও নয়।

উচ্চশিক্ষা যে বহু অর্থব্যয় করে অর্জ্জন করতে হয়, সে বিষয়ে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। গত মাসের প্রবাসীতে তিনি এ বিষয়ে যে নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখেছেন, সে প্রবন্ধ আমি সকলকে পাঠ করতে অনুরোধ করি।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষেরা অর্থের

অভাবে কাতর হয়ে পড়েছেন। অপর পক্ষে, এ শিক্ষা লাভ করতে বিদ্যার্থীদের অর্থাৎ আমাদের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের কি বিপুল অর্থব্যয় করতে হয়, তার হিসেব আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের দিয়েছেন। তিনি বলেন যে, পাঞ্জাবে প্রতি ছাত্রকে মাসে ১৫০ থেকে ২০০ টাকা পর্য্যন্ত শিক্ষালাভের দণ্ড দিতে হয়। এ কথা শুনে চমকে উঠতে হয়। পাঞ্জাবের প্রতি কলেজ কি রাজকুমার কলেজ? আমাদের ধারণা ছিল যে, বাঙলার তুলনায় পাঞ্জাব দরিদ্র দেশ। কলেজের ছেলেদের এত টাকা লাগে কিসে?—শুনতে পাই, বিলেতি পোষাকে। বিলেতি শিক্ষা চর্চ্চার অর্থ কি বিলেতি পোষাকের চর্চ্চা!

বাঙলায় অবশ্য বিদ্যাশিক্ষার দাম এর চাইতে ঢের কম। ছেলেদের মাসখরচা বোধহয় গড়পড়তা মাসিক পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু এই পঞ্চাশ টাকাই বাঙলার মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কি অক্লেশে দিতে পারেন? মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চাইতে ছেলেকে B. A. বানাবার ব্যয় সম্ভবতঃ কম নয়। যুগপৎ কন্যাদায় ও পুত্রদায়-গ্রস্ত বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আথিক অবস্থা যে ভীষণ, তা' বলাই বাহুল্য। এই বিদ্যাশিক্ষার ফলে বাঙালী জাতির দারিদ্র্য বাড়ছে না কমছে, তা' সকলেরই ভেবে দেখা কর্ত্তব্য। কারণ, জাতীয় দারিদ্র্য উপেক্ষার বিষয় নয়।

(১৬)

যাঁরা বলেন যে, "অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যং" তাঁদেরও জিজ্ঞাসা করি যে, উচ্চশিক্ষা লাভ করে কি বাঙালী জাতি যথার্থ শিক্ষিত

হচ্ছে? রায় মহাশয় বলেন—না। তাঁর কথা তাঁর মুখেই শোনা যাক—

"আমার এই বিজ্ঞান-মন্দিরে যে-সমস্ত ছাত্র B. Sc. Honours লইয়া প্রবেশ করে, তাহাদের সামান্য সামান্য বিষয়ের অজ্ঞতা দেখিয়া আমি হতবুদ্ধি হইয়া যাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত শিক্ষা যে কিরকম মেকী ও ঝুটা, তাহা উপরিলিখিত দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ প্রতি দশজনের ভিতর নয়জন হায়দ্রাবাদ কোথায় বলিতে অক্ষম, এবং 'গাঁথিব নূতন মালা রচিব মধুচক্র' কদাচিৎ তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে। পাঠ্য-পুস্তক তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের বাহিরে যে কিছু শিখিতে হয়, ইহা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধিপ্রার্থিগণ একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছে। কোনরকমে নোট মুখস্থ করিয়া 'তক্‌মা' পাইলেই হইল। বিদ্যাশিক্ষা আবার কি?" [উদয়ন, আষাঢ়, ১৩৪০]

অথচ Science College-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি।

এর থেকে দেখা যায় যে, কি-ঘরে কি-বাইরে, সর্ব্বত্রই এ যুগের প্রধান সমস্যা হচ্ছে বর্ত্তমান দুর্গতির সমস্যা। আর বিদ্বান বুদ্ধিমান লোকদের চিত্ত ঘোর অব্যবস্থিত। ফলে, আজকের দিনে সত্যকথা বলতে বসলে, প্রিয়কথা বলা যায় না। আমার এই মনোভাবকে যদি কেউ pessimism বলেন, তাহলে তাঁর কথার প্রতিবাদ করব না। আমি বাঙালী, অতএব বাঙালী জাতির economic, political ও educational উল্টো-প্রগতির সব লক্ষণ দেখে মনমরা হয়ে গিয়েছি। [শ্রাবণ, ১৩৪০]

তৃতীয় প্রস্তাব

(১)

আমরা উকিলই হই, ডাক্তারই হই, বণিকই হই, সাহিত্যিকই হই,—আমরা কেউই পলিটিক্স্ সম্বন্ধে উদাসীন নই। এর কারণ, এ-যুগে আমাদের মনকে বিষয়-বিশেষে গণ্ডিবদ্ধ করা অসম্ভব। আমরা যে-কোন বিষয়ের ব্যবসা কিংবা চর্চ্চা করিনে কেন, একমাত্র সেই বিষয়ে মনকে আবদ্ধ রাখা অসাধ্য; কারণ, মানুষের সমগ্র মনটি তার ব্যবহারিক মনের চাইতে ঢের বড়। ধরুন, আমি যদি কবি হতুম, ত আমার সমস্ত মনটি ফুল ও চন্দ্রালোক দিয়ে ভরিয়ে দিতে পারতুম না। মনের অনেক অংশ পতিত থাকত, যা'তে চারপাশের ঘটনা আর চারপাশের কথাবার্ত্তা উড়ে এসে জুড়ে বসত। আমরা কল্পনার রাজ্যে সংসার পাততে পারিনে, আর পলিটিক্সের বিষয় হচ্ছে জাতীয় ঘরকরণার বিষয়; সুতরাং পলিটিক্স্ সম্বন্ধে আমরা মুখে মৌন থাকলেও মনে আল্‌গা থাকতে পারিনে।

(২)

শুধু একালে নয়, কোনকালেই সাহিত্যিকেরা পলিটিক্স্ এড়িয়ে যেতে পারেননি। ভারতবর্ষের হিন্দুযুগে কালিদাসের মত আর দ্বিতীয় কবি জন্মায় নি,—অবশ্য ব্যাস-বাল্মীকিকে বাদ

দিয়ে। তবুও কালিদাস এতটা political-minded ছিলেন যে, তাঁর 'রঘুবংশ' থেকে একটা গোটা রাজধর্ম্ম উদ্ধার করা যায়। অন্ততঃ নবীন পণ্ডিতের দল কালিদাসের কাব্য থেকে তাঁর পলিটিকাল আত্মা উদ্ধার করতে পারেন। বলা বাহুল্য কালিদাসের সেকেলে পলিটিক্স্, আমাদের একেলে পলিটিক্স্ নয়, এবং তাঁর অনেক মতামত শুনে আমরা অবাক হ'য়ে যাই; কারণ, সেকালের সামাজিক অবস্থা একালের সামাজিক অবস্থা নয়। ফলে, সেকালের সামাজিক মন একালের সামাজিক মনও নয়।

(৩)

আমি কালিদাসের কতকগুলি কথা, তাঁর পলিটিকাল মতামতের নমুনা হিসেবে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। তার থেকে সকলেই দেখতে পাবেন যে, আমাদের মন তাঁর কথায় পূরো সায় দিতে পারে না।

তিনি ইক্ষ্বাকুবংশের রাজা দিলীপের গুণবর্ণনাসূত্রে বলেছেন যে;—

"রেখামাত্রমপি ক্ষুণ্ণাদামনোর্বর্ত্ম'নঃ পরম্।
ন ব্যতীয়ুঃ প্রজাস্তস্য নিয়ন্তনে'মিবৃত্তয়ঃ॥

(রঘুবংশ, ১ সর্গ—১৭ শ্লোক)

অস্য বাঙলা,—

"সারথীচালিত রথের চক্র যেমন পূর্ব্ববর্ত্তী রথের বর্ত্ম অর্থাৎ দাগ হইতে একটুও এদিকে ওদিকে যায় না, সেইরূপ তাঁহার

প্রজাগণও তদীয় শাসন-প্রভাবে মনুর সময় হইতে প্রচলিত চিরাচরিত আচারপদ্ধতি হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হইত না।” (রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কৃত অনুবাদ)।

মানুষকে রেলের গাড়ীর মত বাঁধাপথে চলতে রাজা বাধ্য করবেন, এ কথা শুনে আমরা চমকে উঠি। এখন জিজ্ঞাসা করি, সে যুগে কি হরিজন-সমস্যা উঠতে পারত?

তিনি অতিথি নামক আর একটি রাজার বিষয় বলেছেন যে,

“কাতর্য্যং কেবলা নীতিঃ শৌর্য্যং শ্বাপদচেষ্টিতম্।
অতঃ সিদ্ধিং সমেতাভ্যামুভাভ্যামন্বিয়েষ সঃ॥

(রঘুবংশ, ১৭ সর্গ—৪৭ শ্লোক)

অর্থাৎ “একমাত্র নীতি অনুসরণ করা কাপুরুষতা; আর একমাত্র শৌর্য্যের দ্বারা শাসন করা পশুধর্ম্ম।” একমাত্র বলের উপর রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা যে পশুধর্ম্ম, একথা মহাত্মা গান্ধীও সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রাহ্য করবেন; কিন্তু কেবল নীতির উপর রাজধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করা যে “কাতর্য্য”, এ কথা এ যুগে কোন সহৃদয় লোক গ্রাহ্য করবে কি?

তারপর কামপঙ্কে নিমগ্ন লম্পটচূড়ামণি রাজা অগ্নিবর্ণের বিষয় তিনি বলেছেন যে, প্রজারা তাঁর দর্শন প্রার্থনা করলে তিনি

“তদ্‌গবাক্ষবিবরাবলম্বিনা কেবলেন চরণেন কল্পিতম্॥”

(রঘুবংশ, ১৯ সর্গ—৭ শ্লোক)

অর্থাৎ তিনি গবাক্ষের ভিতর দিয়ে পা ঝুলিয়ে দিতেন, এবং প্রজারা তাঁর শ্রীচরণখানি দর্শন ক’রেই কৃতার্থ হ’ত। রাজভক্তির

এমন হাস্যকর ট্রাজেডি কালিদাসের ন্যায় মহামনীষির চোখ এড়িয়ে যায়নি। এ কথা শুনে হাসিও পায়, কান্নাও পায়।

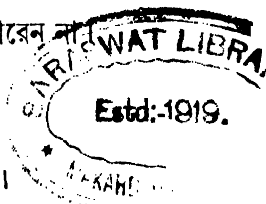
(৪)

এখানে কালিদাসের কথা তুললুম, সংস্কৃত-সাহিত্যে আমার বিদ্যে দেখাবার জন্যে নয়, কিন্তু শুধু এই বিষয়ে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে যে, কালিদাসের মত মহাকবিও পলিটিক্সের পাশ কাটিয়ে যেতে পারেন নি। রাজা-রাজড়ার ideal ছবি আঁকতে হ'লে, সেকালের রাজধর্ম্মের ideal সম্বন্ধে নীরব থাকা অসম্ভব।

কালিদাসের কথা অবশ্য আমাদের ঘরের কথা, অর্থাৎ সেই ঘরের—যে ঘর আমাদের আর নেই, আর কখনো ফিরেও আসবে না। ইংরেজী ভাষায় বলে,—history repeats itself; কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, কারণ history শব্দের অর্থই হচ্ছে তাই, যার আর পুনরাবৃত্তি নেই। ইতিহাসমাত্রেই পরিবর্ত্তনের ইতিহাস; সে পরিবর্ত্তনে মানবসমাজের উন্নতিই হোক, আর অধোগতিই হোক।

সুতরাং কালিদাসের ideal এ যুগে গ্রাহ্য নয়। অপরপক্ষে আমি যদি কালিদাসের যুগে জন্মাতুম, তাহলে সম্ভবতঃ তাঁর রাজনীতি, আদর্শ রাজনীতি ব'লে গ্রাহ্য করতুম। রবীন্দ্রনাথ যাকে "কালান্তর" বলেন, তার ফলে নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়, এবং তার সমাধানের জন্য নতুন ideal-এর জন্ম হয়। দেশের সঙ্গে

দেশের অবশ্য স্পষ্ট প্রভেদ আছে, কিন্তু কালের সঙ্গে কালের প্রভেদ তার চাইতেও বেশি স্পষ্ট। সুতরাং সংস্কৃত সাহিত্যের "রাজনীতি"র অর্থ আর বাঙলা "রাজনীতি"র অর্থ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। আমি যখন বলেছি যে, কালিদাসও politics-এর বিষয় কবিত্ব করেছেন, তখন এ কথাটাও বলা দরকার যে, তাঁ'র পলিটিক্স আর বর্ত্তমানের পলিটিক্স সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এর থেকে এই অনুমান করা যায় যে, সংস্কৃত যুগের পলিটিক্সের এ যুগে কোনও সার্থকতা নেই। চাণক্য এ যুগে আমাদের পলিটিকাল গুরু হ'তে পারেন না।



(৫)

এখন ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক।

বর্ত্তমানে বাঙলার যুগপ্রবর্ত্তক সাহিত্যিক হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে কেউ যে পলিটিক্স সম্বন্ধে উদাসীন নন, সে কথা বলাই বাহুল্য। এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' যে, দেশের যুবকের মন উত্তেজিত ও চঞ্চল ক'রে তুলেছিল, সে কথা কি আর বলবার প্রয়োজন আছে? আজ অবশ্য আমরা 'আনন্দমঠে'র মায়া কাটিয়েছি, কারণ আজকের দিনে বাঙলা নিরানন্দপুরী হ'য়ে উঠেছে। তারপর, বাঙলার পলিটিক্সে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব ত স্পষ্ট। এঁদের দু'জনের কেউ অবশ্য পলিটিসিয়ান নন, কারণ শাসনযন্ত্রের মেরামতের কাজে এঁরা কেউ হাত লাগান নি। এঁরা যা'

বদলাতে চেয়েছেন, তা' হচ্ছে স্বজাতির মন। সাহিত্যের কারবারই হচ্ছে মানুষের মন নিয়ে।

অপরপক্ষে আমাদের মত খুল্ল-সাহিত্যিকদের মন, চারপাশের প্রত্যক্ষ reality-র বহু পরিমাণে অধীন; কারণ, আমাদের কল্পনার দৌড় খুব লম্বা নয়। আর এ-reality, লোকে যাকে বলে পলিটিক্স, তার সঙ্গে নিঃসম্পর্ক নয়। বিশেষতঃ, বর্ত্তমান যুগে political mind হচ্ছে সাধারণ লোকের মনের একটা অঙ্গ। কারণ, এই পলিটিক্সের ভিতর ধর্ম্মের কথাও আছে, অর্থের কথাও আছে। আমার বিশ্বাস, এ-যুগের পলিটিক্সের মোটা কথা হচ্ছে economics. আর অর্থের সঙ্গে সাহিত্যের কোন সম্বন্ধ না থাকতে পারে, কিন্তু সাহিত্যিকের সঙ্গে অর্থের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। সুতরাং আমরা সাহিত্যিকেরাও পলিটিক্সের মতিগতি সম্বন্ধে দু'চার কথা বলতে বাধ্য,—পলিটিসিয়ানরা আমাদের পক্ষে এ-আলোচনা যতই অনধিকারচর্চ্চা মনে করুন না কেন।

(৬)

এখন সাহিত্যিকের কৈফিয়ৎ ছেড়ে তথাকথিত চারপাশের reality-তে ফিরে আসা যাক। আমি অনুমান করেছিলুম যে, বিলেতের ইকনমিক্ কন্‌ফারেন্স ব্যর্থ হবে। ইতিমধ্যে হয়েছেও তাই। প্রতি দেশের প্রতিনিধিরা নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করতেই চেষ্টা করেছেন; কারণ, পৃথিবীর বর্ত্তমান ইকনমিক্

দুর্গতি হ'তে উদ্ধারের কোনও পথ আবিষ্কার করতে সক্ষম হন নি। অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধে পরিণামে এক পক্ষের হার হয়, অন্য পক্ষের জিত হয়। কিন্তু ইকনমিক্ যুদ্ধের ধর্ম্ম হচ্ছে এই যে, এর ফলে সকল পক্ষেরই একসঙ্গে হার হয়। আর এই হারের অন্যতম ফল হচ্ছে পৃথিবীর ইকনমিক্ অধঃপতন। ইকনমিক্ যুদ্ধ বন্ধ হ'লেই যে কলকারখানা সব আবার পূরো দমে চলবে, কুলি-মজুরেরা সব খাটতে আরম্ভ করবে, আর পৃথিবী ফের ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে, এমন কোনও কথা নেই। এ experiment-এর ফল কি হবে, সে ভবিষ্যতে দেখা যাবে; অবশ্য যদি পৃথিবীর প্রবলপরাক্রান্ত জাতিরা এ experiment করতে রাজি হন। কিন্তু যেখানে মনের ও মতের মিল নেই, সেখানে সে experiment করবার সম্ভাবনাও নেই।

আমরা দূর থেকে রয়টারের মুখে যে খবর পাই, তাতে মনে হয়, ইকনমিক্স্ শাস্ত্রে যাকে বলে stability of money, তারই ব্যবস্থা করবার জন্য এ কনফারেন্স বসেছিল। জনৈক ইংরেজ ইকনমিষ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে লিখেছেন যে,—

"Commercial crises are not due to prices going up and then down : but on the contrary, the movement of prices is the result of the crises."

এ শাস্ত্রবচন যদি সত্য হয়, তাহলে crises-এর চিকিৎসা না করে, তার একটি উপসর্গের চিকিৎসার চেষ্টা যে ব্যর্থ হবে, সে ত ধরা কথা।

(৭)

এই সব দেখেশুনে মনে হয়, আমরা আদার ব্যাপারী, জাহাজের খোঁজে আমাদের কি দরকার? এর চেয়ে আমাদের ঘরের কথা নিয়েই নাড়াচাড়া করা ভাল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের ঘরের কথাও তেমন স্পষ্ট নয়।

সেদিনকার পুণা কন্‌ফারেন্সে কি হল, তা কি কেউ বলতে পারেন? কংগ্রেসের বড় কর্ত্তারা civil disobedience ত্যাগ করলেন, না জিইয়ে রাখলেন?

মহাত্মা গান্ধীর জনৈক সহকর্ম্মী ডাক্তার বলেছেন যে, মহাত্মা তাঁদের জন্য যে ব্যবস্থা করেছেন, তা' হচ্ছে "the same old prescription"—চমৎকার রসিকতা। কিন্তু এই রসিকতাই কি সত্য কথা?—মহাত্মা বলেন. না। আসল প্রস্তাব তিনি বড়লাটের কাছে করতেন, বড়লাট যদি তাঁকে দর্শন দিতেন। সে প্রস্তাব যে কি, সে কথা তিনি বলতে পারেন না; কারণ উভয় পক্ষের কথাবার্ত্তার ফলে সে প্রস্তাব মূর্ত্তিমান হ'ত। তবে এই পর্য্যন্ত বোঝা যায় যে, প্রস্তাবটি শান্তির প্রস্তাবই হত।

যা' হয়নি, তা' নিয়ে দুঃখ করা বৃথা। এখন কংগ্রেস কোন পথে চলবে তা' কি কেউ বলতে পারে? কর্ত্তারাই যখন মনস্থির করতে পারছেন না, তখন অন্যের পক্ষে তা' অনুমান করা অসম্ভব। সুতরাং সে বৃথা চেষ্টা করব না। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর মতে যে কংগ্রেস চালিত হবে, এমন ত মনে হয় না। যদি না মহাত্মা আবার কোনও নতুন কথা উদ্ভাবন করেন, যাতে দেশের

লোক চঞ্চল হয়ে ওঠে। মহাত্মা গান্ধী হচ্ছেন একজন mystery-man ; সুতরাং তাঁর কার্য্যকলাপের গতিবিধি নজিরের সাহায্যে অনুমান করা যায় না।

(৮)

মহাত্মা গান্ধী এতদিন ভারতবর্ষের পলিটিকাল ক্ষেত্রে ছিলেন এক, এখন তিনি শূন্য হয়ে যাবার পথে দাঁড়িয়েছেন। অন্ততঃ তিনি যে এ-ক্ষেত্রে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকবেন না, তার নানা লক্ষণ দেখা যাচ্ছে।

এখন মহাত্মা গান্ধী যদি সরে দাঁড়ান, কিংবা আর পাঁচজনে মিলে তাঁকে সরিয়ে দেয়, তাহলে তাঁর পরিত্যক্ত পদে যে অপর কেউ প্রতিষ্ঠিত হবে, তার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। শুনতে পাই, কংগ্রেসের দলে ছোট ছোট বহু dictator আছেন। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ যে একমাত্র dictator হয়ে উঠবেন, তার কোনই সম্ভাবনা নেই। কারণ, এঁরা সকলে এতদিন মহাত্মা গান্ধীর হুকুমেই চলে আসছেন।

পাঁচজনে মিলে কাউকেও dictator বানাতে পারে না। লোকে dictator হয় নিজগুণে। মহাত্মার আমি মন্ত্রশিষ্য নই, এবং একদিনের জন্যেও যে হইনি তার কারণ, তাঁর মন্ত্রের অর্থ আমি কস্মিন্‌কালেও হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি—না ধর্ম্ম সম্বন্ধে, না পলিটিক্স সম্বন্ধে। কিন্তু তা' সত্ত্বেও এ-কথা অস্বীকার করা অসম্ভব যে, তাঁর তুল্য চরিত্রবল আজকালকার অন্য কোনও

leader-এর নেই। এই চরিত্রবল যে কত বড় শক্তি, তা' মহাত্মা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, অপরে কি বলে, তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না; কিন্তু কে বলে, তার উপরই তার মূল্য নির্ভর করে।

(৯)

আর এক কথা; কংগ্রেস নামক প্রতিষ্ঠানও এর পর নবরূপ ধারণ করবে। নামের সঙ্গে রূপের যে কোনও নিত্যসম্বন্ধ নেই, এ কথা বলাই বাহুল্য। হিন্দুধর্ম্ম নামটা বহুকাল থেকে চ'লে আসছে, অথচ এই ধর্ম্ম যে কালে কালে ও দেশে দেশে কত বিভিন্ন ও বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে, তা' ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে, সকলেই প্রত্যক্ষ করতে পারবেন। আর ইংরেজী democracy শব্দের প্রাচীন গ্রীসে যে অর্থ ছিল, বর্ত্তমান ইউরোপে কি সেই অর্থ আছে?—এর থেকে প্রমাণ হয় যে, বস্তু চলে গেলেও তার নাম থাকে। সুতরাং এ প্রতিষ্ঠান নব-কলেবর ধারণ করলেও, তার পুরোনো নাম সম্ভবতঃ বজায় থাকবে।

ভারতবর্ষের সনাতন সমস্যা হচ্ছে, বহুকে এক করবার সমস্যা। পুরাকালে এ সমস্যা ধর্ম্ম ও আচারগতই ছিল। এ-যুগে পলিটিক্সে সেই সমস্যাই আবার নতুন আকার ধারণ করেছে। কি ধর্ম্ম, কি পলিটিক্সের সকল প্রতিষ্ঠানের মর্ম্মকথা এই। যুগে যুগে লোকের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে মনেরও পরিবর্ত্তন

হয়। ফলে, যুগে যুগে সমস্যার মীমাংসার নতুন উপায়ও উদ্ভাবিত হয়। সুতরাং কংগ্রেসের যে নতুন চেহারা হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ঠিক কিরূপ হবে, তা বলা কঠিন। যুগে যুগে মানুষের মনে নতুন আশা ও ভয়ের সৃষ্টি হয়, এবং ওই আশা ও ভয়ই আমাদের কর্ম্মজীবন নিয়ন্ত্রিত করে। উভয়ের মধ্যে ভয় প্রবল হলে, সমাজ পিছু হটে; আর আশা প্রবল হলে, সমাজ এগিয়ে যায়।

(১০)

এই নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের ভাঙ্গা-গড়ার মুখে যে বাঙলা তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাঙলার নতুন পলিটিকাল পার্টি যে কি রূপ ধারণ করবে, তা' জানিনে; কিন্তু যে রূপই ধারণ করুক, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত যদি অসময়ে ইহলোক ত্যাগ না করতেন, ত' সম্ভবতঃ তিনি এই নতুন পার্টির নায়ক হতে পারতেন।

মানুষে নতুন অবস্থার উপযোগী নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে, কিন্তু সেই সঙ্গে পুরোনোর জের টানতে বাধ্য হয়। সুতরাং আগামী পলিটিকাল পার্টিতে পুরোনো পলিটিকাল পার্টির কর্ত্তা-ব্যক্তিদেরও স্থান থাকবে।

যতীন্দ্রমোহনের পলিটিকাল কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই। কারণ আমি তাঁর পলিটিকাল দলভুক্ত ছিলুম না। তবে তিনি যে কতদূর দেশপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, আজকের দিনে সকলেই তা জানেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, তাঁর মৃত্যুর চার-পাঁচদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙ্গে আমাকে বলেছিলেন যে, তাঁর সহকর্ম্মীদের মধ্যে কাউন্সিলের মেম্বর হিসেবে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সব চাইতে উপযোগী ; কারণ, তিনি উক্ত সভায় মনের কথা স্পষ্ট করে ব্যক্ত করতে পারতেন, অপর পক্ষের প্রশ্নের হাত-হাত জবাব দিতে পারতেন, অপরের যুক্তির খণ্ডন করতে পারতেন। এ দেশের শাসনযন্ত্র যে নতুন করে গড়া হচ্ছে, তার ফলে এ দেশের নবযুগের পলিটিক্স প্রধানতঃ কাউন্সিল-গত পলিটিক্স হবে, এবং যতীন্দ্রমোহন বেঁচে থাকলে সে পলিটিক্সে কৃতিত্ব দেখাতে পারতেন, এই আমার বিশ্বাস।

(১১)

এই অবসরে আমি যতীন্দ্রমোহনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তাঁর সঙ্গে আমি বহুকাল হতে সুপরিচিত। সম্ভবতঃ তিনি যখন ব্যারিষ্টার হয়ে বিলেত থেকে ফিরে আসেন, সেই সময়েই প্রথমে আমি তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। এর একটি কারণ, তাঁর পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের পূর্ব্বপরিচয় ছিল।

পলিটিক্সের বাইরেও মানুষের একটি সামাজিক দিক আছে। সেই সামাজিক লোক হিসেবে যতীন্দ্রমোহন ছিলেন আমার নিকট সুপরিচিত। আর এই সামাজিক যতীন্দ্রমোহন ছিলেন অতিশয় ভদ্র, মিষ্টভাষী, ধীরপ্রকৃতির লোক। সামাজিক হিসেবে তাঁর একটী মহাগুণ এই ছিল যে, তিনি তাঁর পলিটিকাল মতামত

আমাদের গ্রহণ করতে বলেন নি। এমন কি, সে বিষয়ে আমাদের সঙ্গে কখনও আলোচনাও করেন নি। তিনি আমাদের মানুষ হিসেবেই দেখতেন, political animal হিসেবে নয়।

অবশ্য যতীন্দ্রমোহনের বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচয় ছিল না, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার কখনো সাহিত্যিক আলোচনাও হয় নি। পলিটিক্স, ধর্ম্ম ও সাহিত্য সম্বন্ধেও আমাদের নানা মত আছে, তাই এইরূপ আলোচনার ফলে পরস্পরের ভিতর মত-ভেদের সৃষ্টি হয়। যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে তাঁর এই মৌনতার ফলে আমার কখনও কোনও মতামতের সংঘর্ষ ঘটেনি।

ফলে, তাঁর সামাজিক ব্যবহার ও কথাবার্ত্তা আমার কাছে চিরকালই প্রিয় ছিল। যতীন্দ্রমোহনের মনের এই সহজ উদারতা সভ্য মানবের একটি মহাগুণ।

(১২)

বাঙলা যখন তার আংশিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, তখন কে বাঙলার রাষ্ট্রনায়ক হবে, তা' বলা অসম্ভব—এই হচ্ছে আমার মত।

কিন্তু এই সূত্রে আর একটি কথা বলতে চাই। কোন ব্যক্তিবিশেষকে দেশের একমাত্র অধিনায়ক করা, এ যুগের লোকের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। Hero-worship-এর যুগ চ'লে গিয়েছে ; বিশেষতঃ রাজনীতির ক্ষেত্রে। কারণ, মতামত সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী হওয়া এ যুগে আমাদের মনের ধর্ম্ম নয় ; অপর

পক্ষে কোন ব্যক্তি-বিশেষের পক্ষে hero হ'য়ে ওঠবার সুযোগও এ যুগে কম।

এ বিষয়ে জগদ্বিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক Bergson-এর মত নিম্নে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"আধুনিক ইউরোপের মহাজাতির ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যায় যে, এ যুগে ইউরোপে মহা বৈজ্ঞানিক, মহা আর্টিষ্ট, মহাযোদ্ধা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছেন, কিন্তু ক'জন মহা রাষ্ট্রনায়ক জন্মেছেন?"

এর কারণ নাকি—

"মানুষের মতিগতি ক্ষুদ্র সমাজভুক্ত হবার পক্ষেই অনুকূল। কিন্তু একটি মহাদেশের এমন কেউ মহামন্ত্রী হ'তে পারেন না, যিনি বহুসম্প্রদায়ের মনঃপূত ভাবে রাষ্ট্রের ব্যবস্থা করতে পারেন। উপরন্তু, একটি মহাদেশ শাসন করবার উপযোগী কোনরূপ শিক্ষাও নেই, দীক্ষাও নেই। সুতরাং এ আর্ট কোনরূপ শিক্ষার ফলে আয়ত্ত করা যায় না।"

সম্ভবতঃ Bergson-এর মত সত্য।

দুঃখের বিষয় আমরা দোটানার মধ্যে পড়েছি। একদিকে আমরা ইউরোপের নব ডিমোক্রাটিক ভাবের অধীন, অপরপক্ষে আমাদের সনাতন মহাপুরুষ-পূজার মায়াও কাটাতে পারিনি।

বাঙলা যে পলিটিকাল জগতে তার স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে, এ সংবাদ আমার কাছে শুভ সংবাদ। কারণ, এ অবস্থায় আমাদের দৃষ্টি বাঙলার মাটি, বাঙলার জলের উপর পড়তে বাধ্য এবং এই

নব-দৃষ্টির প্রসাদে দেশের reality-র সম্বন্ধে, আমাদের অভাব অভিযোগ সম্বন্ধে আমরা বেশি সজ্ঞান হব।

বাঙালীর শিক্ষা, বাঙালীর স্বাস্থ্য, বাঙালীর ধন, বাঙালীর প্রাণ তখন আমাদের প্রধান ভাবনার বিষয় হবে। বাঙালীর বর্ত্তমান শিক্ষা যে জাতির অভ্যুদয়ের অনুকূল নয়,—এমন কথা আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রভৃতি অনেকে বলছেন; এবং বাঙলা ভাষার প্রতি অবজ্ঞা নাকি এ শিক্ষার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। বাঙলা ভাষা যে কেন বাঙালীর মনোভাবের বাহন হয়ে উঠতে পারছে না, সে বিষয়ে আজ বাগ্‌বিস্তার করব না, কেননা সে বিষয়ে অনেক বল্‌বার কথা আছে। বাঙলা কতক পরিমাণে তার পলিটিকাল স্বাতন্ত্র্য লাভ করলে, বাঙালীর দৃষ্টি দেশের ইক-নমিক অবস্থার উপর পড়তে বাধ্য; তার ফলে কত ধানে কত চাল হয়, সে জ্ঞানও আমরা লাভ করব, এবং এ-জ্ঞানের পিছু পিছু সঙ্গত কর্ম্মও আসবে।

এইমাত্র সংবাদ পেলুম যে, আমাদের ঘরের একটি ছেলের টাইফয়েড রোগে অকালমৃত্যু ঘটেছে। এ ঘটনায় এক মুহূর্ত্তে বাইরের সঙ্গে মনের সকল যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। এখন মনকে যা অভিভূত করেছে, তা হচ্ছে একমাত্র পারিবারিক দুর্ঘটনা। সুতরাং আজ এখানেই থামি। Bergson যা বলেছেন, সে কথা ঠিক। প্রকৃতি আমাদের মন এমন ভাবে গড়েছে যে, তা পরিবার নামক অতি ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যেই মূলতঃ আবদ্ধ।

[ভাদ্র—১৩৪০]

চতুর্থ প্রস্তাব

(১)

আমি ইতিপূর্ব্বে যে-সব ঘরে-বাইরের কথা নিয়ে নাড়াচাড়া করেছি, সে-সব প্রধানতঃ দেশী পলিটিক্স ও বিলেতি ইকনমিক্সের কথা; যদিচ আমি পলিটিসিয়ানও নই, ইকনমিষ্টও নই। আমি যদি কিছু হই ত—সাহিত্যিক; অর্থাৎ সেই জাতের লেখক, যাকে অন্য কোন শ্রেণীতে ফেলা যায় না। দেশ-বিদেশের পলিটিক্স ও ইকনমিক্স্ সম্বন্ধে এ যুগের লোক সম্পূর্ণ উদাসীন হতে পারেন না; কেননা, এক জাতির মনের সঙ্গে অপর সব জাতির মনের যোগ আজ ঘটেছে। এর ফল ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, তা বলা কঠিন। অবশ্য পৃথিবীর কোন কোন জাতি অপর দেশ থেকে নূতন idea-র আমদানী বন্ধ করতে চান। কেবল যে বিদেশী মালের আমদানীর পথে সে-সব জাতি প্রাচীর তুলে দিচ্ছেন, তাই নয়; নূতন মতও বয়কট করছেন।

সেদিন Julian Huxley-র একখানা বইয়ে পড়লুম যে, রুষিয়াতে এখন Wells-এর Outlines of History নামক বিখ্যাত পুস্তকের প্রবেশ নিষেধ। Julian Huxley বিলাতের একজন প্রথম শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, কিন্তু তিনিও idea-র এইরূপ অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী নন। তাঁর কথা এই—

"One wonders sometimes just what would happen if young Communism were suddenly subjected to all the blasts of doctrines current in other countries. Perhaps freedom of ideas is confusing after all."

তা হতে পারে ; কিন্তু আমরা পলিটিক্স ও ইকনমিক্স্ সম্বন্ধে ইউরোপীয় মতামত, "কুছ্ নেহি ত থোড়া থোড়া" শুনতে বাধ্য।

(২)

এখন এই দেশ-বিদেশের কথা, আমাদের এক কান দিয়ে ঢুকে আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায় না। মানুষে কথা কয়, অপরের মনকে স্পর্শ করবার জন্য। সেই জন্যই অপরের কথা আমাদের মনকে শুধু ছোঁয় না, নাড়াও দেয় ; আর সে মনকে অল্পবিস্তর ব্যস্তও করে। এই কারণে আমি পলিটিক্স ও ইকনমিক্স্ শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ না হলেও, ও-সব বিষয়ে টীকাটিপ্পনি কাটবার অধিকার আমার আছে। সুতরাং দেশ-বিদেশের পলিটিকাল ও ইকনমিকাল হাল-চাল সম্বন্ধে দু'চারটি উপর-চাল দিতেও কুণ্ঠিত হইনি।

আমি যা' পূর্ব্বে বলেছি, তার একটিও আশার কথা নয় ; প্রায় সবই আশঙ্কার কথা। তাই এই পূজার সময় সে বিষয়ে নীরব থাকব মনে করেছি। এ সময়টা দেশে আনন্দের সময়, সুতরাং যে কথা শুনে লোক নিরানন্দ হতে পারে, সে কথা এখন না বলাই শ্রেয়। শুধু তাই নয়, এ কটা দিন মানুষের মন বর্ত্তমানের বন্ধন কাটিয়ে আমাদের অতীতে হাওয়া বদলাতে যায়

—যে অতীতে মানুষের জীবন এতটা গুরুভার ছিল না বলে আমাদের বিশ্বাস। বিজয়ার পরেই আমরা আবার সকলেই মনে ও প্রাণে বর্ত্তমানে ফিরে আসব, আর অন্নসমস্যা, বস্ত্রসমস্যা, স্বরাজ-সমস্যা, হরিজন-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাব ও বকাবকি করব। ইতিমধ্যে আমাদের মাতৃভাষা সম্বন্ধে দু'চার কথা বলা যাক্। এ কথা যে ঘরের কথা, তা' বলাই বাহুল্য; আর আমাদের মত সাহিত্যিকদের পক্ষে মধ্যে মধ্যে ভাষার কথাটা স্মরণ করাটাও স্বাভাবিক।

(৩)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কিছুদিন থেকে, আমাদের মামুলি শিক্ষা যে লোকের জ্ঞানও বেশি কিছু বৃদ্ধি করছে না, আর শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অন্তরে চিন্তা-শক্তিও জাগ্রত করছে না, এই মত প্রচার করছেন। রায় মহাশয় বাঙলার একজন শিক্ষাগুরু এবং তাঁর এ মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতার উপরেই গড়ে উঠেছে। তাঁর মতে আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতির ব্যর্থতার মূল কারণ এই যে, আমাদের মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন নয়।

এ মতটা অবশ্য নূতন নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন "বঙ্গদর্শন" প্রথম প্রকাশ করেন, তখন এ-বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেকালে লোকে নাকি এই প্রশ্ন তুলেছিল যে, বাঙলায় "পড়বার মত বই নেই; অতএব পড়ব কি?"

তারপর রবীন্দ্রনাথও বহুকালাবধি এই কথাই বলে আসছেন।

এবং যুগে যুগে শিক্ষিতাভিমানী লোকেরা তাঁর কথা কবির কথা বলে উপেক্ষা করে এসেছেন।

তারপরে আমিও এঁদের পদানুসরণ করে এই কথাটারই পুনরুক্তি করি। যে সভায় এ বিষয় আমি আলোচনা করি, সে সভার সভাপতি ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়; এবং তিনি আমার মতামত গ্রাহ্য করেন। তা'হলেও, আমাদের কথায় সমাজের মোহনিদ্রা ভাঙ্গেনি।

এখন খ্যাতনামা অধ্যাপকরা যখন সেই পুরোনো কথা আবার নূতন করে বলছেন, তখন আশা করি এ বিষয়ে সমাজ নিশ্চিন্ত থাকতে পারবে না। সাহিত্যিকদের কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায়—কিন্তু যাঁরা শিক্ষিত সম্প্রদায়কে নিজহাতে গড়ে' তুলছেন, শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের কথা উপেক্ষা করা মূর্খতা।

(৪)

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় একমাত্র অধ্যাপক নন, যিনি শিক্ষাক্ষেত্রে এ বিদ্রোহের সুর তুলেছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বিনয়কুমার সরকার 'প্রবর্ত্তক' পত্রে ইংরাজি ভাষায় একটি নাতিহ্রস্ব প্রবন্ধ লিখেছেন, যার শেষকথা এই যে,—বাঙলা শিক্ষার বাহন নয় বলেই, আমাদের পলিটিকাল মন এখন আকাশে ঝুলছে; সে মনকে আবার বাঙলার মাটিতে নামাতে না পারলে আমাদের পলিটিকাল বলা-কওয়া অনেকটা নিস্ফল

হবে, যেমন আজ হচ্ছে। তাঁর আসল বক্তব্য এই যে, আমাদের idealism হচ্ছে ইংরাজীতে দর্শনের ভাষায় যাকে বলে একটা abstract মনোভাবের মোহ; সেই মনোভাবকে concrete করবার দিন আজ এসেছে। আর মাতৃভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন হ'লে, মাতৃভূমির প্রতি আমাদের মনের টান বাড়বে।

আমি গোড়াতেই বলেছি যে, আজ আমি কোনরূপ পলিটিকাল অথবা ইকনমিক সমস্যাকে স্পর্শ করব না। কিন্তু এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাকি ভারতবর্ষকে বাদ দিয়ে একমাত্র বাঙ্গালী nationalism-এর চর্চ্চা এ যুগে কর্ত্তব্যও নয়, সম্ভবও নয়। অধ্যাপক সরকার ইউরোপের যে-সব দেশের উল্লেখ করেছেন, যথা জার্ম্মানি, ফ্রান্স ইত্যাদি, সে-সব দেশের লোকের মনোভাব আমরা আত্মসাৎ করতে পারব না। কারণ এ-সব দেশ পরস্পরবিরোধী, এবং এই বিরোধই সে-সব দেশের ন্যাশানালিজমের প্রাণ।

ভারতবর্ষে এক প্রদেশের সঙ্গে অপর প্রদেশের এইরূপ মনোমালিন্যের সৃষ্টি কি কাম্য?—অবশ্যই নয়। বহুকে এক করবার প্রবৃত্তি ভারতবর্ষের সনাতন ধর্ম্ম; নিখিল ভারতকে পলিটিকালি একক্ষেত্র করবার প্রবৃত্তি এই সনাতন মনোভাবের নূতন বিকাশ মাত্র। আমার অন্ততঃ বাঙ্গালী পেট্রিয়টিজম্ যথেষ্ট আছে; কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বলতে আমি বিরোধ বুঝিনে।

ঘরে বাইরে

(৫)

বাঙলা ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন না হওয়ার দরুণ আমাদের শিক্ষার কি বিভ্রাট ঘটেছে, সে কথা ত অনেকে বলেছেন ও বলছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ভাষার অগ্রগণ্য স্থান নেই বলে যে আমাদের মাতৃভাষা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয়ে উঠছে না, এ সত্যটা অনেকের চোখ এড়িয়ে গেছে।

আমি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে মোটেই উদাসীন নই; যদিচ অধ্যাপনা আমার ব্যবসা নয়। এস্থলে আমি বঙ্গভাষার সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তির প্রধান অন্তরায় কি, সেই সম্বন্ধে দু'চার কথা বলব।

ভাষা শুধু ভাবের ভাষা নয়, জ্ঞানেরও ভাষা। এমন কি হৃদয়ের ভাষা যে জ্ঞানের উপর কতটা নির্ভর করে, তা' পাঠক-মাত্রেই জানেন। জ্ঞানকাণ্ডহীন হৃদয়ের ভাষা "হা হুতাশ" মাত্র।

এখন আমাদের ভাষা যে নানারূপ জ্ঞানপ্রকাশের ভাষা হয়ে ওঠেনি, তার প্রধান কারণ এ ভাষা আজও আমাদের বিদ্যাশিক্ষার ভাষা নয়।

মানুষে যাকে মনোভাব বলে, তা' বহুল পরিমাণে মানুষের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অবশ্য আমরা অনেক নূতন জ্ঞান ইংরাজী ভাষার মারফৎ লাভ করেছি। আর তার প্রভাবও আমাদের সাহিত্যে স্পষ্ট। কিন্তু সে-সব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে বসেনি, তার প্রমাণও নিত্য পাওয়া

যায়। এই বিদেশী ভাষায় শিক্ষিত আমাদের মনে এ-সব জ্ঞানবিজ্ঞানও বিদেশীই থেকে যায়; অর্থাৎ সে-সব আমাদের অন্তরঙ্গ হয় না।

(৬)

বাঙলা ভাষার উন্নতির যাতে গতিরোধ না হয়, সে বিষয়ে আমরা সকলেই আগ্রহবান। কিন্তু এই সূত্রে আমরা সাহিত্যিক অসাহিত্যিক মিলে যে বচসা করেছি, সে সবই অনর্থক। অর্থাৎ এ যুগে বাঙলা ভাষার যদি রূপ বদলে গিয়ে থাকে ত, সে রূপান্তর ঘটেছে আমাদের তর্কের প্রসাদে নয়, লেখকদের যুগোপযোগী লেখার গুণে।

একটা উদাহরণ দিই। "সবুজ পত্রে"র আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই একটা মহা তর্ক ওঠে; সে তর্কে আমিও যোগ দিই, অথচ সে তর্কটা যে নেহাৎ এড়োতর্ক হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। "সবুজ পত্রে"র ভাষাকে অনেকে বীরবলী ভাষা বলে অপাঙক্তেয় করবার চেষ্টা করেন। অথচ বীরবলী ভাষা বলে কোন নূতন ভাষার সৃষ্টি হয়নি। বীরবলের লেখাতে একটা নূতন ভঙ্গী ছিল, কিন্তু এ ভঙ্গী ভাষার ভঙ্গী নয়,—বীরবলের কলমের ভঙ্গী অর্থাৎ মনের ভঙ্গী। সে ভঙ্গী কেউ পছন্দ করেছেন, কেউ অপছন্দ করেছেন। কিন্তু বীরবলের লেখা পড়ে কারও ভয় পাবার প্রয়োজন ছিল না। কারণ লেখক মাত্রেই যে উক্ত ভঙ্গী অবলম্বন করবেন, তার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা ছিল না। এর কারণ,

প্রতি লেখকেরই একটি নিজস্ব ভঙ্গী আছে, এবং পরের ভঙ্গীর অনুকরণ করলে, শুধু পরের লেখার ভেংচানি হয়; ষ্টাইল একজনের ভাল কিম্বা খারাপ হতে পারে; কিন্তু অপরের ষ্টাইল নকল কর্‌লে, সে নকল ভেস্তে যেতে বাধ্য।

(৭)

এই সঙ্গে আর একটি তর্ক উঠল;—বাঙলা সাহিত্যে "চল্‌তি ভাষা" চল্‌বে কি না, এই হল বিচার্য্য। "চল্‌তি ভাষার" অর্থ বোধহয় সেই ভাষা, যে ভাষা লেখায় চলে না, কিন্তু বাঙালীর মুখে মুখে নিত্য চলে। অর্থাৎ মুখের ভাষা ও লেখার ভাষার ভিতর একটি অলজ্ঘ্য ব্যবধান আছে, যে প্রাচীর "সবুজ পত্রে"র দল দিনত্বপুরে টপ্‌কাতে চাচ্ছেন। কিন্তু সাধু ভাষার সঙ্গে চল্‌তি ভাষার প্রভেদ কোথায় এবং কতখানি, সে কথা কেউ বলেন নি; বরং যা' বলেছেন তা' হাস্যকর। বহুকাল পূর্ব্বে ৺রামগতি ন্যায়রত্ন বলেছিলেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'র ভাষা আর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র ভাষা একই ভাষা। এর বহুকাল পরে আবার একদল ক্রিটিক বলেছেন যে, সবুজ পত্রের ভাষা হুতোমি ভাষা। এই তুই উক্তিই সমান সত্য, অর্থাৎ সমান মিথ্যা। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষাজ্ঞান ছিল না, আর হাল ক্রিটিকদের হুতোম প্যাঁচার নক্সার সঙ্গে পরিচয় নেই। নইলে এমন কথা তাঁরা মুখ ফুটে বলতে পারতেন না। কিন্তু এ-সব মতামত যে কত বাজে তার প্রমাণ এই যে, যে ভাষাকে তাঁরা অচল বলে-

ছিলেন, বর্ত্তমান সাহিত্যে সেই ভাষাই বেশি করে চলছে। তরুণ সাহিত্যিকেরা প্রায় সকলেই এই চল্‌তি পথে চলছেন। আর এই ভাষা গুণীর হাতে পড়লে যে কতদূর সুন্দর ও সবল হয়ে উঠতে পারে, তা' যে-কেউ রবীন্দ্রনাথের এ যুগের গদ্য পড়বেন, তিনিই দেখতে পাবেন।

(৮)

আমি যে "চলতিভাষা বনাম সাধুভাষা"র কথা তুলেছি, তার উদ্দেশ্য উক্ত বাসি তর্ককে আবার টাট্‌কা করা নয়। সুধু এই সত্য লেখকদের কাছে নিবেদন করতে চাই যে, আমি যে চল্‌তি ভাষায় লিখতে সুরু করি, তার কারণ নিজের মনেও এ বিষয়ে কোন তর্ক করে লিখতে বসিনি। আগে লিখেছি, তারপরে তর্ক করেছি।

আমি যখন প্রথম বাঙলা লিখতে আরম্ভ করি, তখন অবশ্য সাধুভাষাতেই লিখি। মহাজনরা যে পথে গিয়েছেন, স এব পন্থাঃ—এই বিশ্বাসবশতঃ। কিন্তু ঐ কৃত্রিম ভাষায় লিখতে পদে পদে বাধা অনুভব করতুম। তার ফলে বাঙলা সাহিত্যিক ভাষার মুক্তি কোন পথে, এ প্রশ্ন আমার মনে স্বতঃই উদয় হয়, এবং আমার প্রকৃতি আমাকে দেখিয়ে দেয় যে, মুক্তির পথ এই চলতি পথ। এ পথ অবলম্বন করে আমি আবিষ্কার করলুম যে, আমি যা' বলতে চাই তা' অবাধে বলতে পারি। এরই নাম ভাষার মুক্তি।

অবশ্য রচনার এ রীতির বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে। অনেকে বলেন যে, "সবুজ পত্রে"র ভাষার প্রধান দোষ এই যে, সে ভাষা সংস্কৃতবহুল। ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আমাকে মুখে বলেছিলেন যে, আমাদের ভাষা তাঁর মাতামহের ভাষার অপেক্ষাও সংস্কৃত শব্দে ভারাক্রান্ত। এ কথা শুনে আমি বিচলিত হই নি, কারণ যে সাহিত্যিক মুক্তিলাভ করেছে, শব্দনির্ব্বাচনে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

(৯)

পথটা যে শুধু আমার পক্ষে নয়, অনেক লেখকের পক্ষেই মুক্তির পথ, তার প্রমাণ তরুণ লেখকেরা অনেকেই এই চল্‌তি ভাষার সাহায্যেই আত্মপ্রকাশ করেছেন। তরুণ লেখায় হয়ত অনেক দোষ আছে। কিন্তু তাঁদের কলমের মুখে বাঙলা গদ্য যে অপূর্ব্ব শ্রী ও শক্তি লাভ করেছে, এ কথা কোন সাহিত্যিকই অস্বীকার করতে পারবেন না।

আজকে আমার প্রধান বক্তব্য কথা হচ্ছে এই যে, বাঙলা ভাষা জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষা না হয়ে উঠলে, যথার্থ সাবালক হয়ে উঠবে না।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, যাঁরা ইকনমিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করেন, তাঁদের মধ্যে দু-একজন, যথা অধ্যাপক যোগীশচন্দ্র সিংহ এবং শ্রীযুক্ত অনাথগোপাল সেন, অতি সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় আমাদের ইকনমিক্‌সের কথা শুনিয়েছেন। শ্রীযুক্ত যোগীশচন্দ্র

সিংহ আমাকে মুখে বলেছেন যে, তিনি প্রথমে সাধু ভাষায় লিখতে চেষ্টা করেন, কিন্তু দু'পাতা লিখেই তিনি আবিষ্কার করেন যে, উক্ত কৃত্রিম ভাষায় তাঁর বক্তব্য কথা প্রকাশ করতে পারছেন না। তখন তিনি এই চল্‌তি ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফলে তাঁর আয়ত্ত বিদ্যার ভাগ আমাদের মত সাধারণ পাঠকদের দিতে পারছেন। আর যাঁরা New Physics-এর নতুন কথা বাঙালী পাঠককে শোনাচ্ছেন, তাঁরাও রচনার এই রীতিই অবলম্বন করেছেন। এর থেকে আশা করা যায় যে, আমাদের মাতৃভাষা শুধু ভাবের নয়, অচিরে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভাষাও হয়ে উঠবে। মাতৃভাষার প্রচ্ছন্ন শক্তির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে, যদিও আমার শিক্ষাদীক্ষা সবই হয়েছে বিদেশী ভাষায়।

(১০)

বাঙলা ভাষা আমাদের শিক্ষার বাহন না হলে আমাদের শিক্ষালাভের চেষ্টা যে অনেকাংশে ব্যর্থ হবে, এ-বিষয়ে আজকের দিনে সাহিত্যিক ও শিক্ষকেরা একমত।

এ দেশে শিক্ষাপ্রচারের বর্ত্তমান যন্ত্র হচ্ছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—আর বিশ্ববিদ্যালয়ও বাঙলা ভাষার প্রবেশের জন্য একটি খিড়কির দুয়োর খুলে দিয়েছেন। এই সংকীর্ণ দ্বার দিয়ে আমাদের মাতৃভাষা যে উক্ত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়কে অধিকার করে নেবে,—এ আশা দুরাশা। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়েরও একটা ব্যবহারিক মন আছে, সে মন সাহিত্যিক

মনের অনুগমন করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তাব্যক্তিরা আমাদের পাঁচ বিষয় শেখাতে চান, কিন্তু নিজেরা কিছু শিখতে চান না। যথার্থ শিক্ষা যে কাকে বলে, সে সম্বন্ধে তাঁরা মাথা ঘামান না; কিন্তু শিক্ষার পদ্ধতি যে কি, তা' তারা জানেন। সুতরাং উক্ত পদ্ধতির সঙ্গে যা' খাপ না খায়, এমন কোন জিনিষের তাঁরা তোয়াক্কা রাখেন না। এই কারণে মনে হয় যে, বাঙলাকে শিক্ষার বাহন করবার পূর্ব্বে, তাঁরা একটি নতুন "ন ভূত ন ভবিষ্যতি" পারিভাষিক ভাষার সৃষ্টি করতে ব্রতী হবেন ;—যে ভাষা বাঙালী বিদ্যার্থীদের কাছে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ভাষা হবে।

তাঁরা ভুলে যান যে, পারিভাষিক ভাষা আমাদের ঐ মৌখিক ভাষা থেকেই ক্রমবিকশিত হয়, যেমন অপর সকল দেশেই হয়েছে ; এবং তার অঙ্গপুষ্টি করবার জন্য ইংরাজী ভাষা থেকে বহু শব্দ টেনে নিতে হবে। বৈজ্ঞানিক পরিভাষা কারও private property নয়। অতএব এ আহরণ হরণ হবে না।

[আশ্বিন—১৩৪০]

পঞ্চম প্রস্তাব

(১)

এবার পূজোর ক'টা দিন ঘরে বসেই কাটালুম। এ সময়ে ঘরে বসে থাকার ভিতর একটু নূতনত্ব আছে। কারণ আমি যে সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, সে সম্প্রদায়ের যাঁরা বারোমাস দেশে থাকেন, তাঁরা এ সময়ে বিদেশে যান; আর যাঁরা বারোমাস বিদেশে থাকেন, তাঁরা দেশে ফেরেন। এ ক'দিনের জন্য বিদেশে যাওয়ার উদ্দেশ্য শুধু দেশ-ভ্রমণ নয়, সেই সঙ্গে হাওয়া-বদলানো। বায়ু-পরিবর্ত্তন করলে নাকি লোকের অগ্নিমান্দ্য সারে। আর অগ্নিমান্দ্যটাই হচ্ছে কলিকাতাবাসীদের পোষা রোগ।

বাঙলার লোকের যাই হোক, বাঙলার প্রকৃতির কিন্তু শরৎকালেও অগ্নিমান্দ্য হয় না। বাঙলার প্রকৃতির গ্রীষ্মকালের জ্বর বর্ষার দু'মাস একটু চাপা থেকে, শরৎকালে আবার ফুটে বেরোয়। এই শরৎকালের temperature-বৃদ্ধির কারণ, গ্রীষ্ম-কালের relapse কি recrudescence, সে বিচার ডাক্তাররা করুন; আমরা রক্তমাংসের দেহের মারফৎ টের পাই যে, শরতের সঙ্গে সঙ্গেই গ্রীষ্মের পুনরাবির্ভাব হয়। এ কালটা বাঙলাদেশে সুখস্পর্শও নয়, সুখসেব্যও নয়। সুতরাং পূজোর সময়ে এখান থেকে পালানোই শ্রেয়; অন্ততঃ তার পক্ষে, যার ঘরে পূজো নেই কিন্তু পুঁজি আছে। পূজোর উত্তেজনার মধ্যে থাকলে,

শীত-গ্রীষ্মের জ্ঞান মানুষের থাকে না। সে উত্তেজনার পিঠপিঠ অবসাদ আসে, বিজয়ার পর। আর এই অবসন্ন অবস্থায় ম্যালেরিয়া আমাদের চেপে ধরে। অতঃপর পাড়াগাঁয়ে ত তাই হয়; আর কলকাতায় হয় আমাদের সাহেবি ব্যারাম—typhoid। আমরা যেমন যেমন সভ্য হচ্ছি, সেই সঙ্গে সভ্য রোগেরও আমদানি করছি। একেই বলে সভ্যতার দাম।

(২)

আমি গোড়াতেই বলেছি যে, পূজার ক'টা দিন আমি ঘরে বসেই কাটিয়েছি। ফলে পূজার কোন সাড়াশব্দ পাইনি, ঢাক ঢোলের হট্টগোলও আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করে নি। এর কারণ কলকাতার যে অঞ্চলে আমি বাস করি, তার উত্তরে ও পূর্ব্বে মুসলমানের বাস, এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে ইংরাজদের। ফলে মহরমের ক'দিন রণবাদ্যের চোটে কান ঝালাপালা হয়; আর বারোমাস-ত্রিশদিন সাহেববাড়ী থেকে gramophone-এর চীৎকারে পাড়ার শান্তিভঙ্গ হয়। ভাল কথা, চৈতন্যের সম-সাময়িক নবদ্বীপের শাক্তরা নব বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নগরসঙ্কীর্ত্তন শুনে বিদ্রূপ করে বলতেন যে—, ভগবান কি কালা? তাঁকে এত চীৎকার করে ডাকো কেন? কিন্তু তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে, শক্তিপূজার ঢাকের বাদ্যি মোটেই শ্রোত্র-রসায়ন নয়। ধর্ম্মের নামে এদেশে যত গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে, আমার বিশ্বাস অন্য কোন দেশে এতটা হয়নি। জনৈক ফরাসী সাহিত্যিক বলেছেন

যে. সঙ্গীত অর্থে organised noise। সঙ্গীতমাত্রই যে উক্ত পর্য্যায়ভূক্ত, তা অবশ্য নয়; কিন্তু আমাদের দেশে পূজো-আর্চ্চার music যে organised noise, সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই। এ দেশে রণবাদ্য ও ধর্ম্মসঙ্গীত, এই দুই একই জাতের। আমাদের দেশে ধর্ম্ম হয়ত বেরিয়েছে ব্রাহ্মণদের মাথা থেকে, আর ঢাক-ঢোল প্রভৃতি হরিজনদের বাদ্যযন্ত্র। সুতরাং এ দুয়ের বেখাপ্পা মিশ্রণে এই গোলমালের সৃষ্টি হয়েছে। এই organised noise জিনিষটা আমার বিশ্বাস, হরিজন-সমস্যারই একটি সরব অঙ্গ। তবে এমনও হতে পারে যে, এই সাঙ্গোপাঙ্গ পূজা, কোন অনার্য্য পূজাপদ্ধতির আর্য্য সংস্করণ।

(৩)

দুর্গোৎসব থেকে আল্‌গা থাকলেও, বিজয়ার মোহ আমি আজও কাটাতে পারিনি। বৎসরের মধ্যে ঐ বিজয়ার দিনটে আমার কাছে আজও একটা বিশেষ দিন। অভ্যাসবশতঃ আমার মনে এই সংস্কার জন্মে গেছে যে, বিজয়ার দিন ও ঠাকুর ভাসানোর দিন একই দিন। কিন্তু এ বৎসর ঋতু যেমন ভেস্তে গিয়েছে, তেমনি ভাসানটাও উভয়সঙ্কটে পড়েছিল। দশমীতে ঠাকুর বিসর্জ্জন দেবার বাধা ছিল এই যে, সেদিন বিকেলটা ছিল বৃহস্পতিবারের বারবেলা, আর তার পরের দিন ছিল ত্র্যহস্পর্শ। ফলে এ-বৎসর বিজয়া ছিল একদিন, ভাসান হয়েছে দুদিন। আর সে দুদিনই আমি সন্ধ্যার প্রাক্কালে গঙ্গার ধারে রাজপথে যাই

ঠাকুর-বিসর্জ্জন দেখতে। সেখানে গিয়ে দেখলুম যে, মা এবার এসেছিলেন ঘোড়ায় চড়ে, আর তাঁর ভক্তরা তাঁকে গঙ্গাযাত্রা করালেন লরিতে চড়িয়ে। এর থেকে বোঝা যায় যে, সভ্যতার যানবাহনের আশ্রয় কেউ ত্যাগ করতে পারে না, এমন কি আমাদের দেবদেবীরাও নয়। আমরা চরকায় সূতা কাটতে পারি, কিন্তু গরুর গাড়ীতে দিল্লী যাই নে, যাই রেলের গাড়ীতে; আর আমরা ঘোর স্বদেশী প্রবন্ধ লিখতে পারি, কিন্তু তা ছাপি বিলেতি মুদ্রাযন্ত্রে। এক কথায়, আমরা মুখে যাই বলিনে কেন, আমরা কি মনে, কি দেহে, যন্ত্রের অধীন। এই যন্ত্রযুগের উপর আমাদের রাগ এই কারণে যে, আমরা পৃথিবীসুদ্ধ লোক যন্ত্রের অধীন হয়ে পড়েছি; কিন্তু যন্ত্রকে আমাদের অধীন করতে পারিনি। তাই ইউরোপের আজ প্রধান সমস্যা হচ্ছে, কি করে' মানুষ যন্ত্রকে তার অধীন করতে পারবে। সে ভূভাগে বর্ত্তমান যুগে Capitalism-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে আসলে যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ কল-কারখানাই Capitalism-এর জন্মদান করেছে। ইউরোপ অবশ্য এ যুগে যন্ত্রপূজার ধর্ম্মে বিশ্বাস হারিয়েছে। কারণ ইউরোপের এ জ্ঞান আজ হয়েছে যে, যন্ত্র সভ্যতার দেবতা নয়, বাহনমাত্র।

(৪)

সে যাই হোক্, এ ক'টা দিন চোখ বুজে কাটাইনি। কাটিয়েছি, পূজোর সংখ্যা মাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্র পড়ে'। ভাল কথা, মাসিক পত্র ও সাপ্তাহিক পত্রে বিশেষ কোনও প্রভেদ

আছে কি ? অন্ততঃ ও দুয়ের পূজোর সংখ্যায় ত নেই। দুয়েতেই ছোট গল্প আছে, ছোটবড় কবিতা আছে, এবং দুর্গাপূজার আধ্যাত্মিক ও scientific ব্যাখ্যা আছে। দুর্গাপূজার উৎপত্তি ও কালক্রমে পরিণতির ইতিহাস লেখা, এ যুগের পণ্ডিতদের একটা ফ্যাসন হয়ে উঠেছে। দেবদেবীর প্রতি ভক্তি যখন লোকের মনে কমে আসে, তখন তাঁরা জ্ঞানের বিষয় হয়ে উঠেন। আর এ যুগের জ্ঞানের অর্থই হচ্ছে scientific জ্ঞান, অর্থাৎ সেই জ্ঞান যা' historical method-এ লাভ করা যায়। দুর্গা এখন antiquarian-দের হাতে পড়েছেন। অবশ্য নব পণ্ডিতরা এ বিষয়ে নানা বিদ্যার পরিচয় দেন, কিন্তু তাঁদের গবেষণা আমাদের মন স্পর্শ করে না। এর একটি কারণ, আমরা জানি যে একটি fact আছে, কিন্তু উক্ত fact-এর উৎপত্তির সম্বন্ধে আমরা প্রায় সকলেই অজ্ঞ, আর সে উৎপত্তির সন্ধান যে পণ্ডিতরা জানেন, এ কথা আমরা সহজে বিশ্বাস করিনে। কারণ পণ্ডিতেরা বিদ্যের আঁক যতই কষুন, তাঁরা অবশেষে ঠিকে ভুল করেন। আর তা ছাড়া এ বিষয়ে antiquarianism হচ্ছে আসলে sentimental antiquarianism ; অর্থাৎ তা যুগপৎ মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের কথা। যাঁদের দুর্গার প্রতি ভক্তি আছে, তাঁরা এ antiquarianism-এর ধার ধারেন না; আর যাঁদের science-এর প্রতি ভক্তি আছে, তাঁরা এই sentimentalism সহ্য করতে পারেন না। সুতরাং এরকম লেখা পূজোর বাজারেই চলে, বিদ্যার মন্দিরে চলে না।

(৫)

বাঙলা দেশে নূতন পত্র নিত্যই প্রকাশিত হয় ; কিন্তু এই সব নূতন পত্রের অঙ্গে চোখে পড়বার মত কোনও নূতনত্ব থাকে না। “উদয়ন” হচ্ছে একখানি নূতন পত্র, এবং প্রথমেই চোখে পড়ে— এ পত্রের ছাপা অতি চমৎকার। এ যুগে মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞান, রাগদ্বেষের একমাত্র বাহন হচ্ছে মুদ্রাযন্ত্র। সুতরাং কোনও পত্রিকার ছাপা উপেক্ষা করবার বিষয় নয়।

যেকালে পৃথিবীতে হাতের-লেখা পুঁথির প্রচলন ছিল, সেকালের কোনও কোনও “আখরিয়া” অতি চমৎকার পুঁথি লিখতেন। কারণ সেকালের আখরিয়াসমাজ, স্বসম্প্রদায়কে artist হিসাবে গণ্য করতেন। ফলে দেশে-বিদেশে আজও অনেক পুঁথি পাওয়া যায়, যে সকল পুঁথিকে লোকে work of art বলে গণ্য করে।

মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আখরিয়াদের পেশা মারা গেছে। কেউ আর এখন হাতের লেখা লিখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করতে পারে না। মুদ্রাযন্ত্র এখন এ আর্টকে মেরেছে। কলের ধর্ম্মই হচ্ছে হাতকে বিকল করা।

অপরপক্ষে মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে সকলেই ছাপতে পারেন, কিন্তু সকলে ভাল ছাপতে পারেন না। সকল দেশেই ছাপানো একটি আর্ট হয়ে উঠছে, এবং এ আর্ট আয়ত্ত করতে হলে, তার জন্য শিক্ষা চাই, সাধনা চাই। ভাল ছাপা হেলায় হয় না।

সুতরাং "উদয়নে"র ছাপা দেখে আমি অত্যন্ত সুখী হয়েছি। আশা করি এ বিষয়ে "উদয়নে"র দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হবে।

(৬)

"উদয়নে"র আর একটি মহাগুণ এই যে, তার ছাপা প্রায় নির্ভুল। এই গুণ আমার কাছে একটি অসামান্য গুণ। তার কারণ, প্রথমতঃ আমার হস্তাক্ষর ছাপার অক্ষর নয়; দ্বিতীয়তঃ আমার বানানও কাঁচা। বোধ হয় যাঁর হাতের লেখা পাকা, তাঁর বানানও পাকা। তবে এ কথা সত্য যে, সব ইংরেজ লেখকদের হাতের লেখা সহজপাঠ্য নয়। আমি একটি ইংরেজ লেখককে জানি, যাঁর বই পড়ে আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করতুম, কিন্তু তাঁর চিঠি পড়া ছিল তেমনি দুঃখদায়ক। বিলেতে কম্পোজিটারদের বাহাদুরি আছে, কারণ তারা ঐ হস্তাক্ষর থেকেও পাঠ উদ্ধার করতে পারে। এর থেকে আমার মনে হয় যে, বিলেতি কম্পোজিটাররা দেশী epigraphist-দের সমতুল্য। আমার হস্তাক্ষর অত দুর্বোধ্য নয়, কারণ আমি একজন বড় লেখক নই। অবশ্য কোনও কোনও বড় লেখকের হাতের লেখাও অতি সুন্দর, যেমন রবীন্দ্রনাথের। সম্ভবতঃ কালিদাসের হাতের লেখা ঐ জাতীয় ছিল, আর মাঘ ভারবির লেখা আমারই মত। যাক্ ও সব বাজে কথা। আমার আর এক দোষ আছে, প্রুফের সব ভুল আমার চোখে পড়ে না। চালের পোকা বাছার মত সূক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তি সকলের নেই। সুতরাং যে কাগজের সম্পাদক আমাকে প্রায় নির্ভুল প্রুফ পাঠান, তিনি

আমার নমস্ত। "উদয়নে"র প্রূফগুলিও প্রায় নির্ভুল। এই নির্ভুল ছাপার আমি যে এত পক্ষপাতী, তার কারণ এই ছাপার গুণে, বাঙালা ভাষা যে আমি শুনে শিখেছি, পড়ে শিখিনি,—এ সত্য পাঠকদের কাছে ধরা পড়েনা; এক কথায় আমার বিদ্যে ধরা পড়েনা।

(৭)

হঠাৎ "উদয়নে"র গুণগান করবার কারণ কি বলছি।

"উত্তরা" পত্রের গত পূজা-সংখ্যায় বীরবলের একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। সে পত্রখানি ছাপার অক্ষরে পড়ে', রবীন্দ্রনাথের একটি কথা আমার মনে পড়ল। ঐ একই কাগজের একই সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্রও প্রকাশিত হয়েছে। তাতে তিনি দুঃখ করে লিখেছেন যে, "আমার কত পত্রই ডাকঘরের গর্ভপাতস্বরূপে মারা গেছে।" বীরবলের উক্ত পত্রখানি যদি ডাকঘরের গর্ভপাতস্বরূপে মারা যেত ত আমি দুঃখিত না হয়ে সুখী হতুম। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ও-দুর্ঘটনা ঘটবার কোনও সম্ভাবনা ছিলনা। কারণ উক্ত পত্র আমি ডাকঘরের পেটে সঁপে দিইনি, দিয়েছিলুম "উত্তরা"র সম্পাদকের হাতে। ছাপার অক্ষরে উক্ত পত্র এমনি রূপান্তরিত হয়েছে যে, আমি নিজের লেখা নিজেই বুঝতে পারলুম না। "উত্তরা"র প্রূফ-সংশোধক লেখাটির উপর এমনি যথেচ্ছাচার করেছেন যে, আমার বিশ্বাস "উত্তরা"র পাঠকবর্গও এ পত্রের অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। অবশ্য তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

কিন্তু ছাপার অক্ষরে যদি এমন কথা থাকে যে, "এদানিক আমি নেশা ছেড়ে দিয়েছি", তাহলে সেটি লেখকের পক্ষে আক্ষেপের বিষয় হয়; কারণ কোন লেখক নেশা করেন কিম্বা ছাড়েন, তাতে পাঠকের কিছু আসে যায় না। তারপর "লেখা" যে কি কারণে "নেশায়" রূপান্তরিত হল, তার হদিস্ আমরা পাই নি। "লেখা" "নেখায়" রূপান্তরিত হতে পারে—শব্দের এ-হেন লিঙ্গ-পরিবর্ত্তন ছাপাখানার পক্ষে সহজসাধ্য। কিন্তু "লেখা"কে শুদ্ধ করে "নেশা" হয় না।"

(৮)

বানান-সমস্যা বলে বাঙলায় যে একটা সমস্যা আছে, সে কথা আজকাল কোনও কোনও শুদ্ধিবাতিকগ্রস্ত লোক মাসিক পত্রের মারফৎ আমাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন।

কিন্তু এ সমস্যা পাঠকের নয়, লেখকের। ধরুন যদি আমি লিখি "জমি" ত পাঠক অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, আমি কোন বস্তুর কথা বলছি। অপর পক্ষে আমি "জমী" লিখলেও ফল একই হবে। কিন্তু আমি "জমি" লিখব কি "জমী" লিখব, সে সমস্যা শুধু আমার।

দেখা যাক্, এ সমস্যার মীমাংসার কোনও নিয়ম আছে কি না।

বোধহয় সকলেই জানেন যে, আমাদের ভাষায় নানা জাতের শব্দ আছে। শাস্ত্রকারদের মতে তার ভিতর কতক শব্দ "তৎসম",

কতক "তদ্ভব," আর কতক "দেশী"। বলা বাহুল্য, তদ্ব্যতীত আমাদের ভাষায় বহু বিদেশী শব্দও আছে।

বহুকাল পূর্ব্বে রামমোহন রায় উপদেশ দিয়েছিলেন যে, "তৎসম" শব্দের বানান সংস্কৃতের অনুরূপই হওয়া উচিত। অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ" শব্দের বানান অবিকল "ব্রাহ্মণ"ই হওয়া উচিত। কিন্তু তদ্ভব শব্দ আমরা যেমন উচ্চারণ করি, তেমনি বানান করা উচিত। অর্থাৎ "বিবাহের" উপর হস্তক্ষেপ করবার আমাদের কারও অধিকার নেই, কিন্তু তদ্ভব শব্দ "বিয়ে" কি "বে" লিখব, এই নিয়েই ত গোল। সুতরাং এ ক্ষেত্রে বানান উচ্চারণের অনুরূপ হতে পারে না। কারণ যখন আমাদের উচ্চারণের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নেই, তখন বানান উচ্চারণের অনুরূপ করলে, নানা-রকম বানান হবে।

(৯)

এ ত গেল বাঙলা ভাষার মূল সম্বলের কথা। কারণ তদ্ভব শব্দই আমাদের ভাষার প্রাণ,—তৎসম শব্দও নয়, দেশী শব্দও নয়, বিদেশী শব্দও নয়। অবশ্য এ জাতীয় শব্দও বাঙলা ভাষায় দেদার আছে। পৃথিবীর সকল ভাষাই এই ভাবে নানা ভাষা থেকে তিল কুড়িয়ে তাল করেছে।

এখন এই সব দেশী ও বিদেশী শব্দ কোন ব্যাকরণের উপদেশ মত বানান করব? প্রথমতঃ আমরা জানিইনে যে, কোন্ শব্দটা দেশী। এমন দুচারটি শব্দ আমি জানি, যেগুলিকে আমি দেশী বলেই ধরে নিয়েছিলুম; কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিতদের

মুখে শুনছি সেগুলি সব তদ্ভব, অর্থাৎ সংস্কৃতের বংশধর। যদি তাই হয় ত তদ্ভব শব্দের মত তাদের বানান নিয়ে মুস্কিলে পড়তে হয়।

তারপর বিদেশী শব্দও আমাদের ভাষায় কম নেই। আমাদের ভাষার শব্দের ঐশ্বর্য্যের জন্য আমরা আরবী, ফারসী, পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজী ভাষার কাছে ঋণী। শ্রীযুক্ত স্নীতি চট্টোপাধ্যায় বাঙলায় কত আরবী ফারসী শব্দ আছে, তার একটি লম্বা ফর্দ্দ করেছেন। পর্ত্তুগীজ শব্দও বাঙলায় কম নেই, ফরাসী শব্দও অনেক আছে, আর ইংরেজী শব্দ ত আমাদের ভাষায় নিত্য ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু এ-সকল শব্দ বিদেশী শব্দের তদ্ভব শব্দ, সে-সব বিদেশী অভিধানের সাহায্যে আমরা বানান করতে পারিনে। ধরুন "বোতল" "গেলাস" শব্দ কি আমরা Webster-এর অনুরূপ বাঙলায় বানান করতে পারি, কিম্বা উচ্চারণও করি ?

সংক্ষেপে, এই বানান-সমস্যার কোন আশু মীমাংসা হতে পারে না। কালক্রমে এই বানানের একটা ধরাবাঁধা রূপ দাঁড়িয়ে যাবে ; যেমন পৃথিবীর অন্য সব ভাষায়ও দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে এ সমস্যার মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত লেখকেরা কলম গুটিয়ে বসে থাকবেন না ; Shakespeare, Milton প্রমুখ পুরাকালের সাহিত্যজগতের মহারথীরাও যেমন বসে থাকেন নি। সাঁতার শিখে জলে নামা অবশ্য নিরাপদ, কিন্তু মানুষে তার উল্টো পদ্ধতিটাই অনুসরণ করেছে এবং করবে।

তো

(১০)

একটি সুপরিচিত নামের অপরিচিত পত্রের পূজো-সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ পড়ে আমি বিস্মিত হলুম। এ পত্রটি দৈনিক, সাপ্তাহিক কিম্বা মাসিক জানিনে, কেন না এই পূজা-সংখ্যা ব্যতীত উক্ত পত্রের অপর কোনও সংখ্যা আমার চোখে কখনো পড়েনি। উপরন্তু এ বৎসর দেখছি যে, এই পূজোর সময় অনেক দৈনিক এবং সাপ্তাহিক পত্রও পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

এই বড় নামের ছোট পত্রিকাখানির একটি বিশেষ নূতনত্ব আছে। উক্ত পত্রে 'পূজার ছবি' নামক লেখাটি পড়ে আমার মনে হল যেন সেটি আমার হাতেরই লেখা। প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পড়ে বুঝলুম যে, লেখাটি আমারই ; আর সাত আট বৎসর আগে "সবুজপত্রে" সেটি ছাপা হয়েছিল। সম্পাদক মহাশয় অবশ্য লেখকের নাম দিয়েছেন বীরবল ; কিন্তু বীরবল কোন তারিখে কোন পত্রের জন্য উক্ত প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সে বিষয়ে সম্পাদক মহাশয় একদম নীরব। সম্পাদক অবশ্য এ কার্য্যের জন্য আমার অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক মনে করেন নি।

উক্ত প্রবন্ধের পুনরাবির্ভাব দেখে আমি অবশ্য বিস্মিত হয়েছি এবং সেই সঙ্গে খুসীও হয়েছি। আমার পুরোনো লেখার পাঠক সমাজে না হোক, সম্পাদক-সমাজে আদর আছে, তারই পরিচয় পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করলুম। নূতন সম্পাদক মহাশয় যে আমার পুরোনো লেখাকে পাঠক-সমাজে নূতন লেখা বলে চালিয়ে দিতে পারেন, এতে আমার vanity চরিতার্থ হয়।

(১১)

তবে এ ঘটনায় একটু দুঃখিতও হয়েছি এই মনে করে যে, আমাদের লেখার পরমায়ু কত স্বল্প। পাঁচ ছ'বৎসরের মধ্যেই পাঠক-সমাজ একদম ভুলে গেছেন যে, বীরবল নামক একজন চটকদার লেখক কি লিখেছেন। যদি কারও মনে থাকত ত তরুণ সম্পাদক তাকে নতুন বলে চালিয়ে দিতে পারতেন না। আমার দুঃখের দ্বিতীয় কারণ এই যে, বীরবলের লেখার আদর আছে, আর আমার লেখার নেই। অথচ বীরবল যদিচ ইহলোকে বর্ত্তমান আছেন, তবু তাঁকে দিয়ে নূতন কিছু লিখিয়ে নেওয়া কঠিন। শুধু তাই নয়, সম্ভবতঃ আজ তাঁর লেখবার সে শক্তিও নেই। বীরবল ত "উত্তরা" পত্রিকার মারফৎ পাঠক-সমাজকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি "নেশা ছেড়ে" দিয়েছেন; অতএব তাঁর কলমের মুখ দিয়ে এখন আর উল্টোপাল্টা কথা বেরোয় না। বাঙলায় একটী গল্প প্রচলিত আছে যে, জনৈক গাঁজাখোর গাঁজায় টান দিয়ে হাতী কিনতে গিয়েছিলেন, এবং বেজায় চড়া দামে একটি হাতী কিনতে রাজী হয়েছিলেন। হস্তী-বিক্রেতা পরের দিন যখন হাতী নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাকে বলেন যে—"যো হাতী মোলেগা ও চলা গিয়া"; অর্থাৎ নেশা তখন তাকে ছেড়ে গিয়েছে। সম্ভবতঃ বীরবলের অবস্থাও এখন তদ্রূপ। সে যাই হোক্, উক্ত প্রবন্ধ পড়ে' কেন যে আমার হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হয়েছে, সে কথা খুলে বললুম। যদিচ এ-সব লেখকেরই ঘরের কথা, বাইরে বলবার যোগ্য নয়। তা

(১২)

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় উক্ত পত্রে সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটী লম্বা প্রবন্ধ লিখেছেন ; যদিচ তিনি নিজে কখনো সম্পাদকী করেননি, কিছুদিন থেকে শুধু নানা সম্পাদকের উপরোধ রক্ষা করেছেন। সে প্রবন্ধটি অপরকে পড়তে অনুরোধ করা আমার মুখে শোভা পায় না। কারণ তাতে সবুজপত্রের সম্পাদকের তারিফ আছে।

এখন তাঁকে অনুরোধ করি যে, তিনি শুধু সম্পাদকীয় রীতি নয়, নীতি সম্বন্ধে আর একটি প্রবন্ধ লিখুন। নীতির অবশ্য যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু সামাজিক লোকের পক্ষে প্রতি যুগেই ত কতকগুলি বিধি-নিষেধের প্রয়োজন হয়।

উপরোক্তরূপ আহরণ অথবা হরণ করার অধিকার এ যুগের সম্পাদকদের আছে কি না, সে বিষয়ে ধূর্জ্জটি বাবু বিচার করুন। পূর্ব্বে দেশ-বিদেশে অনেকে এ বিষয়ে বিচার করেছেন। কবি রাজশেখর বলেন যে, হরণে কোনও দোষ নেই ; আর ইতালীর দার্শনিক Croce বলেন যে, পরের মনোভাব তার স্বকীয় হয়। কিন্তু এ হচ্ছে মনোভাবের কথা, লেখার কথা ত নয়। আশা করি ধূর্জ্জটি বাবু একটি কথা মনে রেখে এ বিচারে প্রবৃত্ত হবেন ;—সে কথাটী এই যে, এখন বাঙলায় বীরবলী লেখার দুর্ভিক্ষ হয়েছে।

[কার্ত্তিক, ১৩৪০]

ষষ্ঠ প্রস্তাব

(১)

বোধহয় সকলেই জানেন যে, ইংরেজী ভাষায় অসংখ্য শিকারের বই আছে। এ সাহিত্য যেমন বিপুল, তেমনি বিচিত্র। কারণ যাঁরা শিকার করেন, তাঁরা যখন বন্দুক ছেড়ে কলম ধরেন, তখন তাঁরা বাঘ-ভালুকের সুধু বর্ণনা করেই নিরস্ত হন না। মানুষের যেমন আমরা psychology লিখি, ethics লিখি, তাঁরাও তেমনি বন্য জন্তুদের মনস্তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করেন। জানোয়ারদের মধ্যেও যে 'হরিজন' আছে, সে জ্ঞান আমাদের ছিল না। আমাদের বিশ্বাস ছিল যে, বন্যজন্তুদের ভিতর fraternity না থাক, equality আছে। কিন্তু শুনছি এদের ভিতর Hyena নাকি অস্পৃশ্য। তার চেহারা যেমন বীভৎস, তার চরিত্রও নাকি তেমনি কুৎসিত। তবে liberty এদের মধ্যে সর্ব্বসাধারণ। জানোয়ারদের ভিতর মেয়ে-পুরুষ দুই স্বাধীন। Female emancipation-এর সমস্যা এদের নেই। সুতরাং এ সাহিত্য আমাদের একটা নতুন প্রাণী-জগতের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়।

কিন্তু এ আরণ্যক শাস্ত্রের বানপ্রস্থ, মনু-যাজ্ঞবল্ক্যের বর্ণিত বানপ্রস্থ নয়। আমরা বলি "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ", কিন্তু শিকারীদের বানপ্রস্থ যৌবনেই করতে হয়। কারণ নখী-দন্তীদের

সংহার করতে হলে, সেই বয়সেই বনে যাওয়া কর্ত্তব্য, যে বয়সে মানুষে নিজে গলিতনখদন্ত হয়নি। কেননা শিকার একরকম সৌখীন যুদ্ধ। শিকার 'ওরফে' মৃগয়া যে ক্ষাত্রধর্ম্ম, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে।

(২)

শিকার করতে আমরা সকলে ভাল না বাসলেও, নানা জীবজন্তুর রূপ দেখতে ও গুণাগুণ শুনতে আমরা সকলেই ভালবাসি। তার প্রমাণ Zoo-তে গেলেই দেখতে পাবেন যে, উক্ত উদ্যানে জানোয়ারের চাইতে মানুষ নামক জীবের সংখ্যা ঢের বেশি। আর তারা সব ছোট ছেলে নয়। তাদের মধ্যে অনেক বয়স্ক লোকও দেখা যায়। বছর পঁচিশেক আগে আমি একদিন Zoo-তে গিয়ে দেখি যে, বম্বের জনৈক সেকালের কংগ্রেস leader একটি বৃদ্ধ মুখপোড়া হনুমানের সঙ্গে নর্ম্মালাপ করছেন। আমি একটু দূরে থেকে শুনলুম যে, তিনি বানর-প্রবরকে ইংরেজী ভাষায় জিজ্ঞাসা করছেন—"How is your brother Mr.... ?" যে ভদ্রলোকের শারীরিক কুশলের প্রশ্ন করলেন, তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা বাঙালী কংগ্রেস নেতা। এ ঘটনার উল্লেখ করলুম এই দেখাবার জন্য যে, ছেলেমানুষী স্থধু ছোট ছেলেদের ধর্ম্ম নয়, বড় লোকের ভিতরও তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আর জন্তু-জানোয়ারের চরিত্রসম্বন্ধে যে আমাদের কৌতূহল

সনাতন, তার প্রমাণ পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ প্রভৃতি গল্পসাহিত্য। আমি এ-সব গল্প পড়তে আজও ভালবাসি। এর কারণ, পঞ্চ-তন্ত্রের জন্তু-জানোয়াররা কথা কয়—আর শিকার-কাহিনীর বাঘ-ভালুক সব নীরব। Pictures-এর চাইতে talkie কার না অধিক প্রিয় ?

(৩)

প্রবাদ এই যে, পঞ্চতন্ত্র প্রভৃতি বই সেকালের রাজপুত্রদের political philosophy শেখাবার জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। সেকালে রাজধর্ম্মের সঙ্গে পশুধর্ম্মের কি নাড়ীর যোগ ছিল, তা আমাদের কাছে একটা রহস্য। আর আমরা যখন রাজপুত্র নই, তখন জন্তু-জানোয়ারের কাছ থেকে কোনরূপ political philosophy শেখবার আমাদের লোভও নেই, প্রয়োজনও নেই।

একালের শিকার-সাহিত্য থেকে কোনরূপ ফিলজফি উদ্ধার করা যায় না, কারণ শিকারীরা আর যাই হ'ন—ফিলজফার নন। কিন্তু যে-সব জন্তু-জানোয়ার "red in tooth and claw", তাদের কাছ থেকে একটী বড় সত্য Darwin উদ্ধার করেছেন। তিনি বলেন, জীবনের ধর্ম্মই হচ্ছে struggle for existence— অর্থাৎ এই দিবারাত্র পরস্পর মারামারি কাটাকাটি করা। এবং এই কথাই হয়েছে এ যুগের পলিটিক্‌স্ ও ইকনমিক্‌সের মূলকথা ; আর এ ফিলজফির টীকাভাষ্য করছেন এ যুগের নিরীহ পণ্ডিতের দল ! বনের পশুরা কি খেয়ে বাঁচে, তা জানবার শিকারীদের

দরকার নেই; কিন্তু তারা যে গুলি খেয়ে মরে, এটা তাঁরা সকলেই জানেন। তবে পশুরা যদি conference করতে জানত, তাহলে তারা নিশ্চয়ই শিকারীদের disarmament-এর প্রস্তাব করত; এবং সে প্রস্তাব আমাদের মত সাহিত্যিকের দল নিশ্চয়ই অনুমোদন করতেন। যদিচ শিকারীদের মধ্যেও সাহিত্যিক আছেন—অর্থাৎ তাঁরা, যাঁরা শিকার-কাহিনী লেখেন এবং লোকে তা পড়েও। আর এই শিকারী সাহিত্যিকরা নিশ্চয়ই বলতেন যে, হে শ্বাপদকুল! আগে তোমরা তোমাদের নখ উপড়ে ও দাঁত তুলে ফেল, তারপর আমরা বন্দুক ছাড়ব। এ কথা শুনে পশুরা নিরুত্তর হয়ে যেত। কেননা, তাদের সমাজে dentist-ও নেই, নাপিতও নেই।

(৪)

হঠাৎ এ-সব কথা তোলবার কারণ আমার কিছু আছে! সেদিন একখানি চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে শিকারের বইয়ের সাক্ষাৎ পেয়ে, তার পাতা ওল্টাবার লোভ সম্বরণ করতে পারলুম না। বইখানির কাগজ দামী ও ছাপা চমৎকার, আর সেখানি খুলে দেখি যে তার ছবি আরও চমৎকার।

ছবিগুলি সব আলোকচিত্র, ইংরেজীতে যাকে বলে ফোটো-[গ্রা]ফ। আর তার প্রতি ছবিটিই নয়নমুগ্ধকর। এ পুস্তককে [শি]কারের বই না বলে, ছবির বই-ই বলা উচিত। ফোটোগ্রাফও আর্ট হয়ে উঠেছে, এই ছবিগুলি তার প্রমাণ। অথচ এগুলি

কাদের ছবি ?—না বাঘ, ভালুক, সাপের। এই সব ছবি দেখবার লোভেই আমি এই বইয়ের পাতা ওল্টাই এবং সেই সূত্রে দু-চার পাতা পড়িও। বেশি যে পড়িনি তার কারণ, এর লেখক যথার্থ লেখক নন্। তাঁর লেখার ভিতর সাহিত্যের মালমসলা সবই আছে; তাহলেও সে-সবকে মিলিয়ে তিনি মুখরোচক সাহিত্য বানাতে পারেন নি। সে যাই হোক, এক জায়গায় তিনি লিখেছেন যে —

"It is an attempt to take the mind of the ordinary reader for a short time at least away from the constant worries of modern life, away from international politics and economic crises, away from the slogans of communism, socialism, swaraj and self-determination."

এই বই পড়ে যদি দুদণ্ডের জন্যও এ-সব ভাবনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তাহলে শিকারী সাহেবের এ বই লেখা সার্থক হয়েছে।

(৫)

যে-সব বিষয় নিয়ে ইউরোপের মন আজ বিক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্ত হয়েছে, সে-সব বিষয়ে বৃথা চিন্তার হাত থেকে আমরাও রেহাই পাইনে। কালাপানীর ও-পারের কথা আজ এ পারের কথাও হয়ে উঠেছে।

ধরুন এই economic crisis এর কথা। পৃথিবী জুড়ে

আজ টাকার দুর্ভিক্ষ হয়েছে, দুনিয়ার এ দুরবস্থার কথা আমাদের বই পড়ে শিখতে হয় না, ট্যাঁকে হাত দিলেই টের পাওয়া যায়। এ ফাঁড়া যে কি করে কাটিয়ে ওঠা যায়, সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত শুনতে আমরাও বাধ্য। বিশেষতঃ যখন সে-সব মতানুসারে আমরা চলতে বাধ্য নই। কারণ, আমাদের এ বিপদের স্রোত উজিয়ে যাবার সাধ্য নেই, আমরা সুধু স্রোতে ভেসে যেতেই পারি।

গত যুগের ইকনমিক্‌সের একটা মস্ত কথা হচ্ছে Laissez faire, অর্থাৎ বাঙলায় যাকে বলে, "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কো আনে দেও"। অর্থাৎ কোন দেশেরই গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইকনমিক্‌সের হালচালের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। বিংশ শতাব্দীর ইকনমিক্‌ শাস্ত্রে এ কথা একদম বাতিল হয়ে গিয়েছে; আজকের দিনের প্রধান কথা হচ্ছে regulation। এক কথায় প্রতি দেশের গভর্ণমেণ্টকে ইকনমিক জগতের বিধাতা হতে হবে; এখন প্রতি দেশেই নিজের দেশের টাকার ও মালের নৈসর্গিক গতিবিধির মোড় ফেরাতে চাচ্ছেন। আপশোষের কথা এই যে, এক দেশের গভর্ণমেণ্ট যে পথে যেতে চান, আর এক দেশের গভর্ণমেণ্ট বলেন সেটা বিপথ। পরস্পরের মতামতে কাটাকাটি গিয়ে যোগফল শেষটা দাঁড়াচ্ছে শূন্য,—অর্থাৎ নানা গভর্ণমেণ্টের Laissez faire। বর্ত্তমান ইকনমিক্‌ সমস্যা হচ্ছে international সমস্যা, অথচ প্রতি দেশই তার national মীমাংসা করতে চাচ্ছেন। সুতরাং সব মীমাংসা ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে।

(৬)

এই সব প্রয়াসের ব্যর্থতা থেকেই, international politics-এর কথা অনেকের মনে হয়েছে। এবং ইউরোপের বহু মনীষী লোক একটি World State-এর কল্পনা করেছেন। অনেকে আশা করেছিলেন যে, League of Nations সর্ব্ব-প্রকার আন্তর্জাতিক বিরোধের একটা আপোষ মীমাংসা করে দেবে। কিন্তু ফলে তা হয়নি ; হবার কথাও নয়। পৃথিবীতে বহু খণ্ড খণ্ড Nationকে সখ্যসূত্রে আবদ্ধ করে international গভর্ণমেণ্টের সৃষ্টি করা যায় না। কেননা পৃথিবীতে যত Nation আছে ও জন্মাচ্ছে, সবাই স্বাধীন, সবাই প্রধান ; অন্ততঃ স্বাধীন হলেই প্রতি জাতের প্রাধান্যের লোভ বাড়ে। আর প্রতি জাতই যদি ধরে নেন যে, পৃথিবীর ইকনমিক্‌স্ প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ হচ্ছে স্বাধীনতা লাভের একমাত্র ফল, তাহলে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিরোধ যে বেড়েই চলবে, সে ত ধরা কথা। যে Wilson সাহেব League of Nations-এর প্রতিষ্ঠা করেছেন,তাঁরই আর একটি কথা self-determination, Internatioual politics-এর প্রধান অন্তরায়। এ সুধু ইউরোপের কথা নয়। এসিয়ার অন্তর্ভূত নকল ইউরোপ, জাপানেরও কথা। এই সেদিনই জাপান "যুদ্ধং দেহি" ..লে League of Nations-এর এক যুগব্যাপী আলোচনার ..তা প্রমাণ করে দিয়েছে। পৃথিবীতে বহু রাজা থাকার ফ.. যে বর্ত্তমান অরাজকতার সৃষ্টি হয়েছে, সে কথা এখন অস্বীকার ..রা

কঠিন। এই কারণেই ইউরোপে অনেকে আজ পৃথিবীকে একক্ষেত্র করবার কল্পনা করছেন; আর সে এক ক্ষেত্র তাঁদের মতে হবে শ্রীক্ষেত্র, অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলেই গ্রাহ্য হবে। এ ধর্ম্ম যে শিকারী সাহেবের মনের সোয়াস্তি নষ্ট করবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

(৭)

এখন এই World State বস্তুটি কি ?—এ বস্তু যে পৃথিবীতে নেই, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য ; আর সম্ভবতঃ সত্য যুগেও ছিল না,—কিন্তু ভবিষ্যতে হবে। পৃথিবীর নানা Stateকে জোড়াতাড়া দিয়ে এক ষ্টেট হবে, না মানুষের মন থেকেই এ ষ্টেট বেরিয়ে আস্‌বে—যাঁরা মনে মনে এ ষ্টেট গড়ছেন, তাঁদের কথা শুনে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। বিলাতের একজন সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক—H. C. Wells, সম্প্রতি এই World State আমাদের চোখের সুমুখে খাড়া করেছেন। এঁর The Shape of Things to Come নামকসদ্য প্রকাশিত পুস্তকখানি, এই World State-এর আবাহন মাত্র।

লেখক একজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিক, সমাজ সংস্কারক এবং ন্যাসিক। খৃষ্টানরা যাকে বলে, একে তিন, আর তিনে এক াহিত্যিক হিসাবে Wells তাই। সুতরাং এ পুস্তকখানি ারে ইতিহাস, বিজ্ঞান ও কাব্য। এর কারণ তিনি লিখেছেন ষ্যতের ইতিহাস, সনতারিখ সম্বলিত ; এবং ভবিষ্যতে যে-

সব বই লেখা হবে, তার থেকে অনেক মতামত উদ্ধৃত করেছেন। ভবিষ্যতের ইতিহাস যে লেখা যায় না, এমন কথা আমি বলিনে ; কারণ তাহলে অতীতের ইতিহাসও লেখা যায় না। অতীতের ইতিহাস সব একরকম উপন্যাস ; আর ভবিষ্যতের ইতিহাসও যদি সেই শ্রেণীভুক্ত হয়, তাহলে দুই সমান বিশ্বাসযোগ্য। এই বিলেতি ভবিষ্যপুরাণ, আমাদের "ভবিষ্যপুরাণের" সগোত্র।

তবে এ ইতিহাস পড়ে মনে কোনরূপ আশার সঞ্চার হয় না ; কারণ Wells বলেন যে, পৃথিবী এক‌ক্ষেত্র হবার পূর্ব্বে আর একবার তা কুরুক্ষেত্র হবে। অর্থাৎ মানবসমাজের একবার মহাপ্রলয় হবে, তারপর নতুন সমাজের সৃষ্টি হবে। আমরা এই প্রলয়কে যাদৃশ ভয় করি, অজানা নতুন সৃষ্টির উপর তাদৃশ ভরসা রাখতে পারিনে। সংক্ষেপে এ বইয়ের সার কথা এই যে, মানবসমাজের বর্ত্তমান অবস্থা অচল—সুতরাং এ-সমাজের একটা মহাপরিবর্ত্তন ঘটা প্রয়োজন, অতএব অবশ্যম্ভাবী। পরিবর্ত্তনের যে প্রয়োজন আছে, সে কথা আমরাও জানি ; তবে সে প্রয়োজন যে অবশ্যম্ভাবী, সে কথা আমরা মানিনে।

(৮)

অনেকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন যে, আমরা যখন আদার ব্যাপারী, তখন আমাদের জাহাজের খবরে দরকার কি ?— দরকার এই যে, আমরা আদার ব্যাপারী হলেও, জাহাজের খোঁজ করতে বাধ্য। কারণ মানব-সমাজ-তরী এখন মহা ঝড়ে পড়েছে ; সুতরাং তা মাঝ-দরিয়ায় ভরাডুবি হবে, কিম্বা শেষটা কূল পাবে,

এ বিষয়ে আমাদের কৌতুহল অদম্য এবং স্বার্থও জড়িত। ভারতবর্ষ এখন ইউরোপের সমাজতরীর ল্যাং-বোট। World State প্রভৃতির কল্পনা একটা New world-এর কল্পনা—আর সেই New worldএ আমরা সকলেই আশ্রয় পাব আশা করি। এ আশার কোনও মূল আছে কি না, সে প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই। কারণ কোন্ আশাই বা সমূলক? - অথচ আশাই হচ্ছে আমাদের জীবনের একমাত্র সম্বল। আজকের দিন যে পৃথিবীর অতি দুর্দ্দিন, সে বিষয়ে ইউরোপের মাথাওয়ালা লোকেরা প্রায় সকলেই একমত।

যাঁরা আধুনিক ইংরেজী সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত, তাঁরা জানেন যে, Wells এবং Bernard Shawর মতেরও মিল নেই, মনেরও মিল নেই; যদিচ দু'জনেই বড় লেখক ও দু'জনেই Socialist। ফলে Shaw ফাঁক পেলেই Wellsকে বিদ্রূপ করেন, এবং Wells ফাঁক পেলেই Shaw-র উপর ঝাল ঝাড়েন। কিন্তু আমরা দূর থেকে দেখতে পাই যে, উভয়ের মতের মধ্যে আশমান-জমিন ফারাক নেই। Shawর নতুন বইয়ের নাম—The Political Madhouse in America and Nearer Home." Wells যাকে বলেন মহারণ্য, Shaw তাকে বলেন [illegible]লা গারদ। আর আমাদের সমাজ একাধারে অরণ্য ও পা[illegible]লা গারদ। এ বিষয়ে আর বেশী বাক্যব্যয় করব না, কেননা হয় অরণ্যে রোদন করব, নয় প্রলাপ বক্‌ব - অথবা এক স[illegible]দুই।

(৯)

এখন বাইরের কথা ছেড়ে ঘরের কথায় ফিরে আসা যাক। উক্ত শিকারী সাহেব বলেছেন যে, বাঘ-ভালুকের রূপগুণের কথায় মনোনিবেশ করলে মন থেকে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও স্বরাজের ভাবনা দূর হয়। স্বরাজের কথা অবশ্য আমাদের ঘরের কথা; কেননা এ হচ্ছে গোটা ভারতবর্ষের কথা, আর বাঙলাও ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী। সুতরাং এ ভাবনা আমরা সকলেই অল্প-বিস্তর ভাবতে বাধ্য। বাধ্য বলছি এই জন্য যে, আমরা চাই আর না চাই, বাঙলা ইংরেজী দৈনিক পত্র প্রতি সকালে তা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আর সংবাদপত্রের সত্য-মিথ্যে সংবাদের ধার না ধারা আমাদের পক্ষে অসাধ্য; যদিচ আমরা কেউ কেউ মনে করি যে, সংবাদপত্র এ-যুগের কুশিক্ষার বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। ঘুম থেকে উঠে এক পেয়ালা চা গলাধঃকরণ না করলে আমাদের ঘুম ভাঙ্গে না; আর দৈনিক সংবাদপত্র হচ্ছে চায়ের সাহিত্য।

এখন এই স্বরাজ কথাটার নাম সকলেই জানেন, কিন্তু রূপ কারো কাছেই স্পষ্ট নয়। মানুষে একটা নাম পেলে, আর তার রূপ কল্পনা করতে চায় না। এ হচ্ছে মানসিক economy-র একটি বিশেষ ধর্ম্ম।

এই স্বরাজ কথাটা এ দেশের একটা পুরোনো কথা। সংস্কৃত শাস্ত্রেও এ কথাটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু সে অ[illegible]ত্রে। কথাটি সেকালে ছিল ধর্ম্মের কথা,—একালে হয়েছে পলিটিক্সের।

এ ক্ষেত্রে সংস্কৃত 'স্ব' বলতে ব্যক্তিবিশেষ বোঝাত। তাই "বেদান্তেষু যম আহু একপুরুষম্", তাঁকেই শ্রীমদ্ভাগবৎ বলেছেন "স্বরাট্"। এ স্বরাজ্য যে আমরা কেউ লাভ করতে চাই নে, সে কথা বলাই বাহুল্য।

(১০)

পলিটিক্সের স্বরাজ কথার প্রথম আমদানি করেন দাদাভাই নওরোজি, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে। তখন তাঁর কথার অর্থ আমরা স্পষ্টই বুঝেছিলুম ; কেননা কথাটি তখন ছিল Dominion Status-এর দেশী তরজমা মাত্র।

তারপর ছাব্বিশ সাতাশ বৎসর ধরে এ কথাটার যে মুখে মুখে কতরকম অর্থ করা হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আর পলিটিসিয়ানরা নিত্য তার নতুন নতুন মূর্ত্তি গড়ছেন। পলিটি-সিয়ানদের হাতে স্বরাজ এখন যুগপৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের বস্তু হয়েছে,—হয়নি শুধু স্থিতির। অতঃপর বিলেতের পলিটিসিয়ানরা আমাদের স্বরাজের একটা একমেটেগোছের মূর্ত্তি খাড়া করেছেন। সে মূর্ত্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে White Paper-এ। সে মূর্ত্তি দেখে Churchill প্রমুখ রাজপুরুষরা মনে মনে প্রমাদ গণছেন। তাঁরা বলেন, এ White Paper-এ বানান ভুল দেদার ; তাই বিলেতের পলিটিকাল পণ্ডিতেরা সভা করে তার প্রুফ সংশোধন করছেন। Churchill বলেন, তোমরা যা' দিতে চাও তা স্বরাজ নয়—"শ্বরাজ"।

এ বিষয়ে আমার কিছু বলবার অধিকার নেই, কারণ আমিও যা লিখি, অপরে তার বানান শুধ্‌রে দেয়।

এ স্থলে আমি শুধু একটি কথা বলব। আমরা যা' চাচ্ছি, তা হচ্ছে Parliamentary Democracy। এ বস্তুর জন্ম বিলেতে; ইউরোপের অন্যান্য দেশ আজ শ'খানেক বৎসর ধরে এ বস্তুকে স্বদেশে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু আজকের দিনে Parliamentary Democracy-কে কেউ কি আর মহাবস্তু বলে মনে করে? Russia, Italy ও নব জার্ম্মাণী যে করে না, তা ত প্রত্যক্ষ। আর ইংলণ্ড, ফ্রান্সের লোক যে এতে বিশ্বাস হারিয়েছে, তার প্রমাণ তিনিই পাবেন, যিনি আধুনিক ইংরাজী ও ফরাসী সাহিত্যের চর্চ্চা করবেন। তবে অবশ্য আমাদের আদর্শ হচ্ছে ইউরোপের ছাড়া কাপড় পরা।

(১১)

Parliamentary Democracy এখন ইউরোপে গ্রাহ্য নয় বলে যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার ধন হতে পারে না, এমন কথা তিনিই বলতে পারেন, যাঁর বিশ্বাস ভারতবর্ষের ইতিহাস বিলেতের ইতিহাসের মাছিমারা নকল হতে বাধ্য। ইউরোপ যখন লাফাবে বা ডিগবাজী খাবে, তখন ভারতবর্ষকেও লাফাতে কিম্বা ডিগবাজী খেতে হবে। অর্থাৎ আমাদেরও ঘড়ি ঘড়ি মত ও পথ বদলাতে হবে। আমি অবশ্য বিলেত ও ভারতবর্ষকে এক দেশ মনে করিনে। সুতরাং আমার মনে হয় যে, Parliamentary

Democracy-ই এ-যুগে আমাদের একমাত্র আদর্শ হতে পারে। Communism, Fascism প্রভৃতি ইউরোপে যে-সব নব-ism বেরিয়েছে, যাঁরা নিজের দেশকে বিলেতি চশমা দিয়ে দেখেন, তাঁরাই শুধু সে-সব ism-এর একটা না একটাকে নেক-নজরে দেখেন। তাঁরা ভুলে যান যে, ইউরোপে যে যে দেশে যে যে নতুন ism-এর প্রতিষ্ঠা হয়েছে, সে-সব দেশের সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা থেকে স্বভাবতঃ জন্মলাভ করেছে।

Parliamentary Democracy-র অনেক দোষ থাক্‌তে পারে, কিন্তু এর পিছনে যে ফিলজফি আছে, সে ফিলজফি সাধারণ মানবের মনে ধরে। আজকাল যে Parliamentary Democracy-র উপর লোকে বিশ্বাস হারাচ্ছে তার কারণ, এর ফলে অনেক economic সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে, যার মীমাংসা Parliament করতে পারছে না। এই কারণেই Wells World-State-এর কল্পনা করছেন, আর Shaw আমেরিকা ও ইংলণ্ডকে Mad-house বলছেন। এঁদের উভয়েরই জল্পনা কল্পনা বর্ত্তমান ইকনমিক অবনতির ফল। এঁরা উভয়েই ইউ-রোপের উন্নতিকামী, আর এ-যুগে উন্নতির অর্থ হচ্ছে দেশের ধনবৃদ্ধি। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষ ইউরোপ নয়। আর এসিয়া বাদ দিয়ে আমাদের কাছে World-State-এর মানে কি ?

[অগ্রহায়ণ—১৩৪০]

সপ্তম প্রস্তাব

(১)

আমি মাসের পর মাস 'উদয়নে' যে ঘরে-বাইরের কথা লিখ্‌ছি, তার অন্তরে ঘরের চাইতে বাইরের কথাই বেশী থাকে। এর কারণ, ঘরের এখন এমন কোন বড় কথা নেই, যা ভারতবর্ষের বাইরে বাকি পৃথিবীর দিকে পিঠ ফিরিয়ে ভাবা যায়।

দৈনিক সংবাদপত্র থেকে অবশ্য রয়টারের তারের মারফৎ কোথায় কি ঘটছে তা জানা যায়—কিন্তু বোঝা যায় না। বিলেতের মনীষী-সম্প্রদায় এ-সব বিষয়ের একটু বিস্তৃত আলোচনা করেন। সুতরাং ইউরোপের সভ্যতার বর্ত্তমান গতিবিধির কিঞ্চিৎ জ্ঞানলাভ করতে হলে তাঁদের বক্তব্য কথা শোনা নিতান্ত প্রয়োজন।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের অতি আধুনিক ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের মোটা কথা যে এই দুই দেশের চিন্তাশীল লোকদের বই পড়লে পূরো বোঝা যায়, তা' অবশ্য নয়। কারণ এঁদের ভিতরেও নানা লোকের নানা মত আছে।

এর কারণ, পদার্থ বিজ্ঞানের মত অর্থ-বিজ্ঞানের মূলসূত্রগুলি আজও আবিষ্কৃত হয়নি। প্রথমোক্ত সুত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বাঁধা; আর সেগুলি Newton-এর সময় হ'তে অদ্যাবধি সর্ব্ব বৈজ্ঞানিক এমন কি সর্ব্বলোকগ্রাহ্য হয়েছে।

আজকের দিনে অবশ্য Einstein-এর গণিতের প্রসাদে Newton-এর মতামতকে চূড়ান্ত বলে গ্রাহ্য করতে বৈজ্ঞানিকরা ঈষৎ ইতস্ততঃ করছেন। কিন্তু Einstein-এর নব আবিষ্কার Newton-এর আবিষ্কারের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। নব ফিজিক্স পুরোনো ফিজিক্সের evolution মাত্র।

ইকনমিক্স ও পলিটিক্সের মধ্যে আছে মানুষের মন, আর মানুষের মন সুধু বিভিন্ন নয়, বিচিত্র। জড়জগৎ খামখেয়ালী নয়, কিন্তু মানুষমাত্রেই অব্যবস্থিত-চিত্ত।

(২)

ইকনমিক্স ও পলিটিক্স শাস্ত্রে যে মানুষের জীবন-সমস্যার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়নি আর কোনকালেই হবেনা, তা' জানি; তবুও এ-সব শাস্ত্রের সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিচয় থাকলে, এ-সব বিষয়ের কিঞ্চিৎ জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি। অন্ততঃ সমস্যাটি যে কি, তা' বুঝতে পারি। অনেক দিন আগে জনৈক ইংরাজ দার্শনিক বলে গিয়েছেন যে, কোন বিষয়ে মীমাংসা লাভ করবার চাইতে সমস্যার জ্ঞান লাভ করবার মূল্য বেশী। কথাটা মিছে নয়। মীমাংসা পেয়ে আমরা নিশ্চিন্ত হই, কিন্তু সমস্যা আমাদের চিন্তার উদ্রেক করে। আর চিন্তা করাই হচ্ছে মানব-ধর্ম্ম।

আজকের দিনে, ভারতবর্ষের সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হয়েছে দেশের বর্ত্তমান ইকনমিক দুর্দ্দশা হতে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায়। এ ভাবনা থেকে আজ কেউই মুক্ত নয়,—বৈশ্যও নয়, শূদ্রও নয়;

অতএব ক্ষত্রিয়ও নয়, ব্রাহ্মণও নয়। ভারতচন্দ্র বহুকাল পূর্ব্বে প্রশ্ন করেছিলেন যে, "নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" এ কথাটা মনে রাখলে, সকলেই বুঝতে পারবেন যে, বর্ত্তমান অর্থসমস্যা শুধু ব্যক্তিগত নয়, সমগ্র সমাজের। শুধু তাই নয়, ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আর্থিক দুর্গতি যে ইউরোপের আর্থিক দুর্গতির অধীন, সে কথাও তাঁর কাছে স্পষ্ট, যিনি মনো-জগতে কূপমণ্ডুক নন্। ফলে আজকের দিনে ঘরের কথা, প্রধানতঃ বাইরের কথা। এর কারণ, আমরা শক্তিহীন আর ইউরোপের শক্তি প্রলয়ঙ্করী।

রাধা একবার দুঃখ করে বলেছিলেন যে, "ঘর হ'তে আঙিনা বিদেশ।" আজ বোধহয় কোন লোক এ দুঃখ করবেন না। আজকের দুঃখের বিষয় এই যে, "ঘর হতে আঙিনা বিদেশ নয়।" সমগ্র পৃথিবীটা একই গ্রহ, সুতরাং পৃথিবীর লোক আজ একই গ্রহদুর্ব্বিপাকে পড়েছে। তাইতেই আজ অনেকে শান্তিস্বস্ত্যয়নের কথা ভাবছেন। ইকনমিক সমস্যা যে সমাজের মূল সমস্যা, তার কারণ ইকনমিক্সই হচ্ছে সভ্যতার সিঁড়ির প্রথম ধাপ। ও-ধাপটি ভেঙ্গে পড়লে, তার উপরের সব ধাপ হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে, আকাশে ঝোলে না।

(৩)

আমি দিন চারেক আগে একখানি নূতন ইংরেজী বই শেষ করেছি। বইখানির নাম "The Intelligent Man's

Way to Prevent War." আর বইখানি ছ'জন খ্যাতনামা ইংরাজের লেখা।

আমরা বাঙালীরা নিজেদের intelligent men বলে বিশ্বাস করি, আর যেহেতু আমিও একজন বাঙালী. সেহেতু আমারও এ গ্রন্থ পড়বার অধিকার আছে; উপরন্তু লেখকদের অন্যতম H. J. Laski-র লেখার সঙ্গে আমি সুপরিচিত। সুতরাং তিনি এ বিষয়ে কি বলেন, তা' শোন্‌বার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল। সমগ্র বইখানি পড়ে দেখলুম যে, Laski-র প্রবন্ধই এ পুস্তকের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ। Laski হচ্ছেন এ যুগের নব পলিটিক্সের একটি প্রধান শাস্ত্রী। উপরন্তু তিনি ইকনমিক-শাস্ত্রেও পণ্ডিত। তিনি এক যায়গায় লিখেছেন যে—

"That world has become an inescapably inter-dependent unit. An alteration of the price of wheat on the Chicago exchange may alter the whole way of life of an Hungarian peasant ; and the abandonment of free-trade by Great Britain may affect the social economy of all the Scandinavian countries. Anyone who considers the impact of the American departure from the gold standard, in April 1933, upon the commercial habits of Western Europe and Asia, will realise that the sovereign right of a congeries of competing states to take fundamental economic deci-

sions without regard to their impact upon the rest of the world, has become an international danger too great to be endured."

(৪)

"That world has become an inescapably inter-dependent unit"—অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবী যে এক ইকনমিক জালে জড়িয়ে পড়েছে, আর কোন দেশেরই সে জাল ছিঁড়ে পালাবার পথ নেই—সে দেশ বড়ই হোক্ আর ছোটই হোক্, ধনীই হোক্ আর দরিদ্রই হোক্,—এই সত্যের প্রতি বাঙালীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই আমি বেশী করে বাইরের কথা লিখি।

আর একটি কথা, পৃথিবীর সব দেশই আজ ইকনমিক ক্ষেত্রে interdependent হয়ে পড়েছে, কিন্তু নানা দেশ আজ পলিটি-কাল ক্ষেত্রে independent ; ফলে, নানা দেশ নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে নিজেদের উন্নতি করতে না পারলেও, পর-দেশকে আরও বিপন্ন করে ফেলেছেন। এ ভাবে আর বেশী দিন চললে ইউরোপীয় সভ্যতা রসাতলে যাবে—এই ভয়ে ইউ-রোপের অনেক জ্ঞানী লোকে পৃথিবীকে পলিটিক্সের ক্ষেত্রে এক করবার কল্পনা করছেন।

Wells-এর World-State এই কল্পনাপ্রসূত। আমি গত মাসে তাঁর যে বই-এর উল্লেখ করি, Laski সে সম্বন্ধে লিখ-ছেন যে—

"Mr. H. G. Wells has been unquestionably right in insisting that there are no effective middle terms between the anarchy of the pre-League world and a World-State in the full sense of the term."

এ-জাতীয় একটি World-State হলে হয়ত মানুষের সব-রকম আপদ-শান্তি হয়; কিন্তু তা যে হওয়া সম্ভব, তা ত' মনে হয় না; কেননা তার পূর্ব্বে প্রতি জাতির সভ্যতার ইতিহাস, হিসাবের খাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে। আর মানুষ ইতিহাসের জের টেনেই চলে।

(৫)

এ-সব কথা যথেষ্ট স্পষ্ট হলেও, সকলের চোখে পড়ে না। এর কারণ, সকল সত্য কথা মানুষের প্রিয় নয়। যে-সত্য আমাদের প্রিয় নয়, সেই সত্যেরই আমরা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই; আর যিনি তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাঁকে আমরা pessimist বলি। কেউ কেউ বলেন যে, আমি ঘরে-বাইরের বিষয় যা লিখি, তার ভিতর থেকে pessimism-এর সুর প্রকাশ পায়।

আমার মন বাইরের ঘটনার একান্ত অধীন, সুতরাং অবস্থার পর্য্যায়ে যে আমার মনেরও সুর বদলাবে, এ ত' ধরা কথা।

এ যুগে ইউরোপে কেউ আর মানুষকে আশার বাণী শোনাতে পারছেন না। যাঁরা optimist, তাঁরা অবশ্য সমাজকে দিলাশা

দিচ্ছেন। অর্থাৎ যে আশা তাঁদের মনে নেই, সেই আশায় ভর করে থাকতে অপরকে পরামর্শ দিচ্ছেন।

ইংলণ্ডের জনকতক বড় বড় ইকনমিষ্টের নাম করতে পারি, যাঁরা দেশের লোককে ভরসা দিচ্ছেন যে, "কেটে যাবে মেঘ"; কিন্তু কি সূত্রে যে কাটবে, তা ঠিক বলতে পারছেন না। অপর-পক্ষে কালমেঘ যে দিন দিন ঘনিয়ে আস্ছে, তাও তাঁরা অস্বীকার করতে পারছেন না। বরং Way to prevent War প্রভৃতি বইয়ের উদ্দেশ্যই হচ্ছে, সমাজকে এই আসন্ন ঘোর বিপদের বিষয় সতর্ক করে দেওয়া। ভবিষ্যতে মানুষের সঙ্গে যদি মানুষের লড়াই বাধে, তাহলে সে লড়াইও জন্মলাভ করবে বর্ত্তমান economic অরাজকতার ফলে। এরকম নিজে ভয় পাওয়া আর অপরকে ভয় দেখানোর নাম কি optimism?—যদি তাই হয় ত' optimism ও pessimism পর্য্যায় শব্দ হয়ে পড়ে।

(৬)

আমার pessimism-এর কৈফিয়ৎ স্বরূপে আমি বিলাতের একজন শীর্ষস্থানীয় ইকনমিষ্ট G. D. H. Cole-এর ক'টি কথা এখানে উদ্ধৃত করে দেব। আমি বাঙলা রচনাকে ইংরাজী কোটেশন-বিড়ম্বিত করতে ভালবাসিনে। আজকাল যে করি তার কারণ, ইকনমিক্স সম্বন্ধে আমাদের সকল শিক্ষাদীক্ষা আমরা বিলেতী গুরুদের কাছেই লাভ করেছি। সুতরাং এ-সব বিষয়ে আমরা বাঙলায় যা বলি-কই, তা হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে ইংরা

অনুবাদ। দ্বিতীয়তঃ, আমার বিশ্বাস পাঠকসমাজ আমাদের শিক্ষা-গুরুদের কথার বেশী মূল্য দেবেন, কারণ পাঠকসমাজও আমাদেরই মত ইংরাজীশিক্ষিত সমাজ।

G. D. H. Cole তাঁর সদ্যপ্রকাশিত The Intelligent Man's Review of Europe To-day-নামক প্রকাণ্ড পুস্তকের এই বলে উপসংহার করেছেন যে—

"Only fools venture, in the present situation, upon confident prophecy about the economic outlook. So far, only those who ventured upon prophecy since the world-depression began, the pessimists have always been right, and it is tempting to assume that they will go on being right, and to say that there is no prospect of an early recovery from the slump, or even of any sustained upward turn."

বর্ত্তমান অর্থসঙ্কট থেকে নিষ্ক্রমণের কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ কথা বলায় যদি pessimism-এর পরিচয় দেওয়া হয়, তাহলে আমি বলি তথাস্তু!

(৭)

বিলেতী সভ্যতার শৃঙ্খল ও বিশৃঙ্খলামুক্ত ঘরের কথা যদি বলতে হয়, তাহলে অতীত ভারতবর্ষের কথা পাড়তে হয়; অর্থাৎ সেই দূর অতীতের, যখন অর্ব্বাচীন ইউরোপীয় সভ্যতা জন্মলাভ

করেনি। আমি সম্প্রতি বিখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধুর সমাজ ও রাজ্যসৃষ্টি সম্বন্ধে মতের পরিচয় পেয়ে একটু চম্‌কে উঠেছি। কেন, সে কথা পরে বলব।

বসুবন্ধু খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর লোক, এবং তাঁর রচিত "অভিধর্ম্মকোষ" বৌদ্ধদর্শনের একখানি অগ্রগণ্য পুস্তক। এ পুস্তকের যে সপ্তম শতাব্দীতেও যথেষ্ট পঠনপাঠন প্রচলিত ছিল, তা বাণভট্টের কথা থেকেই জানা যায়। বাণভট্ট বলেছেন যে, দিবাকর মিত্র নামক বৌদ্ধাচার্য্যের আশ্রমের পেঁচারাও "অভিধর্ম্মকোষ" আওড়াত। এ অবশ্য ঠাট্টার কথা। বাণভট্ট ছিলেন কবি, তাই তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ সকল জাতীয় দার্শনিককে নির্ব্বিচারে বিদ্রূপ করেছেন।

শঙ্করাচার্য্যও খুব সম্ভবতঃ এ গ্রন্থের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অসঙ্গের "মহাযান সূত্রালঙ্কার"ত তিনি তাঁর বেদান্ত ভাষ্যে আত্মসাৎ করেছেন। শঙ্করের মায়াবাদ অসঙ্গের বিজ্ঞানবাদের হিন্দু-সংস্করণ মাত্র। এই কারণেই বোধহয় সেকালের ভক্তি-শাস্ত্রে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

বসুবন্ধুর "অভিধর্ম্মকোষ" আজও মুদ্রিত হয়নি, সুতরাং মূল গ্রন্থের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। জনৈক ফরাসী পণ্ডিত [illegible]ন্ত উক্ত গ্রন্থ আদ্যোপান্ত ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করেছেন; আমি সেই অনুবাদের বাঙলায় অনুবাদ করে উল্লিখিত কথা ক'টি বাঙালী

পাঠকের কাছে ধরে দেব। আশা করি আমার অনুবাদটি নির্ভুল হবে ; অন্ততঃ তাঁর বক্তব্য সকলেই বুঝতে পারবেন।

(৮)

বসুবন্ধুকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, আদি-যুগে কি পৃথিবীতে রাজা-রাজড়া ছিল ?

এ প্রশ্নের উত্তরে বসুবন্ধু বলেন—না। পুরাকালে মানুষে সকালে ধান কাট্‌ত দিনে খাবার জন্য, আর বিকেলে ধান কাট্‌ত রাত্তিরে খাবার জন্য। তাদের মধ্যে কোন অলসপ্রকৃতির লোক প্রথমে খাদ্য-দ্রব্য সঞ্চয় করে, পরে সকলে তার অনুকরণ করে। সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে—এ বস্তু আমার ও আমার সম্পত্তি—এই কথা মানুষের মনে জন্মলাভ করল। ফলে কাটা-ধান সঞ্চয় করবার প্রবৃত্তি দিন-দিন বৃদ্ধি পেতে লাগল।

এর পর মানুষে শস্য-ক্ষেত্র বিভাগ করে নিতে আরম্ভ করল। তারা সব খণ্ড খণ্ড জমির মালিক হয়ে উঠল, এবং পরস্পরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করে নিতে সুরু করল। এই হচ্ছে চৌর্যাবৃত্তির মূল।

আর এই চুরিডাকাতি বন্ধ করবার জন্য তারা সকলে একত্র মিলিত হয়ে কোন "মনুষ্যবিশেষকে" নিজ-নিজ সম্পত্তি রক্ষা করবার জন্য উৎপন্ন শস্যের ষষ্ঠাংশ দিতে স্বীকৃত হল। মানুষে উক্ত ব্যক্তির নাম দিলে "ক্ষেত্রপ", অর্থাৎ ক্ষেত্র-রক্ষক। যেহেতু তিনি "ক্ষেত্রপ", তাঁর নাম হল ক্ষত্রিয়। যেহেতু তিনি "মহাজন-

সম্মত" এবং প্রজারঞ্জক, তিনি "মহাসম্মত" রাজা ব'লে পরিচিত হলেন। এই হচ্ছে রাজবংশের উৎপত্তির কথা।

বসুবন্ধুর এ সব কথা যে বেদবাক্য, তা অবশ্য নয়। এ যুগের philologist এবং sociologist তাঁর ভাষা-তত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব অবৈজ্ঞানিক বলে অগ্রাহ্য করবেন। তবে তাঁর একটি কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞানসম্মত। আগে ধান না বুনে, পরে মানুষে ধান কাটে কি করে। এর উত্তরে H. G. Wells বলেন যে, আদিম মানব "reaped before he sowed"; অর্থাৎ আগে Consumption পরে Production.

(৯)

বসুবন্ধুর মুখে এ সব কথা শুনে আমি যে একটু চম্‌কে উঠেছিলুম, এখন তার কারণ বলছি। এ যুগের পলিটিক্সের প্রবর্ত্তক Rousseau-র মতের সঙ্গে বসুবন্ধুর মতের আশ্চর্য্য মিল আছে। Social Contract-এর কথাটা ইউরোপে একটি নতুন কথা হলেও—ভারতবর্ষের অতি প্রাচীন কথা। আর সকলেই জানেন রুসোর মত ইউরোপে কি প্রলয় ঘটিয়েছে।

তারপরে বসুবন্ধুর মুখে Property-র জন্মকথা শুনে, Karl Marx নিশ্চয়ই বল্‌তেন, "ভাই, হাত মিলানা"।

এর থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কতকগুলি বিশেষ মতের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করা হচ্ছে সাধারণ মানবধর্ম্ম। কিন্তু, সেই সব মতামত নিয়ে মারামারি কাটাকাটি করা সম্ভবতঃ

ইউরোপীয়দের ধর্ম্ম। আর আমরা ঘরের লোকের সঙ্গে বাইরের লোকের মনের যতটা পার্থক্য কল্পনা করি, আসলে ততটা নেই; এবং humanity কথাটা একেবারে মিছে নয়। যিনি একটু চোখ চেয়ে দেখবেন, তিনিই human being-এর সাক্ষাৎ সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে পাবেন।

তাই আজকাল ইউরোপে যাঁদের বড় মন, তাঁরা পলিটিক্স ও ইকনমিক্সের কথা একটু বড় করে ভাবেন। অপরপক্ষে বর্ত্তমান সভ্য-সমাজে primitive man-এরও অভাব নেই। Bergson বলেন যে, যাঁর একটু অন্তর্দৃষ্টি আছে তিনিই নিজের অন্তরে primitive man-এর সাক্ষাৎ পাবেন।

পৃথিবীর বর্ত্তমান দুরবস্থা একমাত্র জাতিতে জাতিতে কলহের ফল নয়—আমাদের নিজের অন্তরে যে civilized man আছে, তার সঙ্গে আমাদের অন্তরের primitive man-এর বিরোধেরও ফল!

[পৌষ—১৩৪০]

অষ্টম প্রস্তাব

(১)

আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি বাঙলা ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন, যার নাম হচ্ছে ‘চিন্তয়সি’। এ পুস্তকে তিনি আমাদের চিন্তা করতে আদেশ করেছেন, অথবা উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীমান ধূর্জ্জটিপ্রসাদ হচ্ছেন একজন অধ্যাপক। কোন অধ্যাপকের পক্ষে এ আদেশ দেওয়ার অন্তরে একটু নূতনত্ব আছে। কারণ বর্ত্তমান অধ্যাপনার আর্টই হচ্ছে, কাউকে চিন্তা না করিয়ে সকলকে পণ্ডিত করে’ তোলা। অবশ্য ধূর্জ্জটিপ্রসাদ এ উপদেশ শিক্ষার্থীদের দেননি, দিয়েছেন শিক্ষিত সমাজকে। যে সব বিষয়ে তিনি আমাদের চিন্তা করতে অনুরোধ করেছেন, যথা—বিজ্ঞান, মানবধর্ম্ম, সমাজ-ধর্ম্ম ও সাহিত্য, দেশের কথা ও প্রগতি ইত্যাদি—সে সব বিষয়ে আমরা যত বলি তত ভাবি কি না, সে বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ আছে। তবে সকলেই যদি সকল বিষয়েই চিন্তা করতে আরম্ভ করেন, তাহলে তার ফল কি ফলবে বলুন ত! সকলের চিন্তাই যে এক মার্কার হবেনা, তা বলাই বাহুল্য। সকলে একমত হবার সহজ উপায় হচ্ছে, কারো চিন্তা না করা। চিন্তা না করে বাঁধা পথ ধরে চলে যাওয়াই হচ্ছে মানবের সমাজধর্ম্ম। আজকের দিনে যে নানা জাতি Dictator-এর এত ভক্ত হয়ে

পড়েছে, তার একটি কারণ Dictator সমাজকে চিন্তার দায় হতে অব্যাহতি দেন। Lenin কিম্বা Mussolini কি কাউকে হুকুম করেছেন—'চিন্তয়সি'? করেননি বলেই যাঁরা তাঁদের দ্বারা শাসিত নন, তাঁরাই সুধু Bolshevism ও Fascism নিয়ে এত চিন্তায় আকুল হচ্ছেন। কিন্তু স্বাধীন চিন্তা বলে কোন জিনিষ রাশিয়াতেও নেই, ইটালিতেও নেই।

(২)

ধূর্জ্জটিপ্রসাদ আমাদের যে সব বিষয়ে চিন্তা করতে বলেছেন, সে-জাতীয় চিন্তাকে সুচিন্তা বলা যেতে পারে। আমরা সুচিন্তা করি আর না করি, দুশ্চিন্তার দায় আমরা কেউই এড়াতে পারিনে। পৃথিবীতে কখনো কখনো এমন এক একটি ভীষণ ও বিরাট কাণ্ড ঘটে, যা আমাদের সকলকেই চিন্তা করতে বাধ্য করে। গত ১৫ই জানুয়ারীতে বেহারে যে ভূমিকম্প ঘটেছে, ও যার ধাক্কায় বাঙলাও মিনিট পাঁচেক ধরে কম্পান্বিত হয়েছে, সে বিষয়ে আজ কেউ উদাসীন নন। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় আমাদের সকলেরই মন অল্পবিস্তর নাড়া খেয়েছে। আর বাঙালী সমাজ যে আমাদের প্রতিবেশীদের বিপদে কাতর হয়েছে, এর জন্য আমাদের জাতের উপরে আমার ভক্তি বেড়ে গেছে। বাঙালী যে বেহারের বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করছে, এর থেকে প্রমাণ হয় যে, আমরা কেবলমাত্র নিজের সুখ-দুঃখের কথাই ভাবিনে, আর আমাদের মন জাতীয় স্বার্থের

সঙ্কীর্ণ গণ্ডিবদ্ধ নয়। এ অবস্থায় আমরা অপরকে সাহায্য করতে পারি, এক অর্থ দিয়ে আর এক সামর্থ্য দিয়ে। আমরা বাঙালীরা এই ইকনমিক দুর্গতির দিনে দেশশুদ্ধ লোক নিতান্ত অর্থকষ্টে পড়েছি। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে যাঁরা এরকম ব্যাপারে অনায়াসে একশ' টাকা দান করতেন, আজকের দিনে তাঁদের পক্ষে পাঁচ টাকা দান করাও কঠিন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাঙলা বেহারের সাহায্যার্থে যে টাকা ঘর থেকে বার করে দিয়েছে, তা' যথার্থ ই বিস্ময়কর। অবশ্য রিলীফের জন্য চাঁদা একমাত্র বাঙালী হিন্দুই দেয়নি, বর্ণধর্ম্মনির্ব্বিচারে বাঙলার সকল শ্রেণীর লোকই দিয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই ঘোর বিপদের দিনে আমরা সকলেই এক মন, এক প্রাণ—অপরের বিপদ সম্বন্ধে আমরা কেউই উদাসীন নই।

(৩)

বেহারে এই ভূমিকম্পের দরুণ কত লোকের যে মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে দেখতে পাই লোকের মতভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, অসংখ্য সুস্থ সবল লোক পৃথিবীর এক ধাক্কায় ভবলীলা সংবরণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের জন্য অবশ্য আর কিছু করবার নেই,—এক তাদের মৃতদেহের সৎকার করা ছাড়া।

কিন্তু এ বিষয়েও কোন সন্দেহ নেই যে, হতদের চাইতে আহতদের সংখ্যা ঢের বেশী। যারা জীবন ও মরণের মধ্যে 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় রয়েছে, তাদের অনেকের জীবনরক্ষা

করা, অন্ততঃ কষ্টের লাঘব করা, মানুষের সাধ্যের অতীত নয়। চিকিৎসা-শাস্ত্র হচ্ছে প্রকৃতির মারাত্মক শক্তির সঙ্গে লড়াই করবার শাস্ত্র।

চিকিৎসা-বিদ্যাতে আমরা কেউই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিনে, কারণ এ বিদ্যা মানুষকে অমর করতে পারেনি এবং কস্মিন্‌কালে পারবেও না। অথচ এ বিদ্যার উপর আমাদের সকলেরই আস্থা আছে। কারণ চিকিৎসকেরা যে মানুষের দৈহিক যন্ত্রণার উপশম করতে পারে আর তার মৃত্যুর তারিখ পিছিয়ে দিতে পারে,—এ ত' সর্ব্বলোকবিদিত প্রত্যক্ষ সত্য।

এখন সুখের বিষয় এই যে, বাঙালী জাতির ভিতর অনেকে এ বিদ্যা শিক্ষা করেছে। বেহারবাসীদের এই ভীষণ দুর্দ্দিনে বাঙালী ডাক্তাররা যে দলে দলে তাদের স্বেচ্ছাসেবক হয়েছেন, এটা যে বাঙালী জাতির সহৃদয়তা ও গৌরবের কথা, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না,—এমন কি তাঁরাও নয়, যাঁরা Bengalee Babu-দের বাক্যবাগীশ বলে অবজ্ঞা করেন।

(৪)

অবশ্য এ কথাটা যেন আমরা ভুলে না যাই যে, হত-আহতদের সংখ্যা যদি হাজার হাজার হয়, তাহলেও জীবিতদের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। এই লক্ষ লক্ষ লোকও বিষম বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এ বিপদ থেকে তাদের আশু উদ্ধার করা মানুষের সাধ্যের অতীত। প্রকৃতি পাঁচ মিনিটে যা ধ্বংস করে, মানুষে

হাজার বৎসরেও তা গড়ে' তুলতে পারে না। মানুষের হাতে এমন কোনও আলাদিনের প্রদীপ নেই, যার প্রসাদে সে এক নিমেষে উত্তর বেহারকে পূর্ব্ব বেহার করে তুলতে পারে। এই ভূমিকম্পের ফলে ও-প্রদেশের যে ভৌগোলিক পরিবর্ত্তন ঘটছে, তা সকলকেই মেনে নিতে হবে, ও তার উপরেই নূতন বেহার গড়ে তুলতে হবে। অন্য প্রদেশের লোকে এ বিষয়ে তাদের বিশেষ সাহায্য করতে পারবে না। এখন যা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব, সে হচ্ছে তাদের সাময়িক অন্ন-বস্ত্রের অভাব কতকটা দূর করা। এবং সে চেষ্টা সমগ্র ভারতবর্ষের লোক আজ করতে ব্রতী হয়েছে। অবশ্য সে দেশের রাস্তা-ঘাট ঘর-বাড়ী সবই আবার re-build করতে হবে। আমাদের মত লোকের পক্ষে, ঘরে বসে relief committee-কে কোনও পরামর্শ দেওয়া অনধিকার চর্চ্চা করা। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এক্ষেত্রে আমাদের যা করা উচিত, তা বেহারীদের ভিক্ষা দেওয়া নয়, তাদের এই re-building-এর কাজে নিয়োজিত করা, এবং আমাদের সাধ্যমত তাদের অর্থসাহায্য করা। অর্থাৎ relief works-এ তাদের ব্রতী করা, এবং তার জন্য তাদের খাটুনির দাম দেওয়া। বেহারের লোকও আমাদের মতই মানুষ ; আর মানুষ ভিখারীর জাত নয়, হতেও চায় না।

(৫)

এই ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ধাক্কায় সুধু পৃথিবী নামক মৃৎপিণ্ড নয়, আমাদের মনোজগতও যে ঈষৎ বিপর্য্যস্ত হয়ে গিয়েছে,

তার প্রমাণ লোকের কথাবার্ত্তায় নিত্য পাওয়া যায়। আমার জনৈক বন্ধু উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কোন University সহর থেকে আমাকে যে চিঠি লিখেছেন, তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। উক্ত সহরে ভূমিকম্পের কোনও উপদ্রব হয়নি, তথাপি সেখানকার বিদ্বান ও বুদ্ধিমান লোকদের অর্থাৎ প্রফেসারদের মনের চেহারা যে একটু বদলে গিয়েছে, উক্ত চিঠিতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। বন্ধুবর লিখেছেন যে, "একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছেন—ভূমিকম্পের ফলে লোক কত ধার্ম্মিক হয়েছে?— অবশ্য হিন্দুধর্ম্মে, অর্থাৎ জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাসী। ভগবৎ বিশ্বাসের কথা আসছে না, সেটা বরং কমেছে, কারণ তিনি বড় নিষ্ঠুর প্রতিপন্ন হয়েছেন। জ্যোতিষ-শাস্ত্রে আস্থার সঙ্গে সঙ্গে লোকে দার্শনিক হয়ে উঠেছে—মানুষ কত ছোট, সহুরে সভ্যতা কত ক্ষণভঙ্গুর ও প্রকৃতি দেবী ভীষণ খামখেয়ালী। কিন্তু ধর্ম্মকে দোষ দিই কেন? লোকে, সকলে নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে আস্থাবান লোকে—অধ্যাপকের দল—কিরকম বৈজ্ঞানিক হয়ে পড়েছে দেখছেন? লোকে ভূতত্ত্ব, আবহাওয়ার তত্ত্ব, Geo-Physics কেমন শিখে ফেলেছে দেখছেন?"

(৬)

এ চিঠি অবশ্য কতকটা বিদ্রূপ করে লেখা। কিন্তু মানুষ যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পায় যে, পায়ের নীচের মাটি অটল নয়, তখন মনের দেশে idea-র ভিত্তিই যে অটল, এ বিশ্বাস একটু

টলমলায়মান হবে, এতে আর আশ্চর্য্য কি? কতকগুলি তথাকথিত বিজ্ঞান-সম্মত idea যে আমাদের মনোরাজ্যের অটল ভিত্তি, এই হচ্ছে আমাদের নব-শিক্ষিত সমাজের বিশ্বাস। কালিদাসের ভাষায় বলতে গেলে—বৈজ্ঞানিক সত্য সব 'স্থির-ভক্তি-যোগসুলভ।' কোনও কোনও বিষয়ে আমাদের স্থিরভক্তি অস্থির হয়ে পড়েছে, আমার মতে সেইটেই আমাদের মনের লাভ। অর্থাৎ আমরা বিজ্ঞানের axiom-গুলোকে postulate হিসেবে দেখতে শিখব। বন্ধুবর নিশ্চয়ই জানেন যে, আজকের বিজ্ঞানের সঙ্গে গতকল্যের বিজ্ঞানের ঝগড়াই এই নিয়ে যে, গতকল্যের axiom-গুলোর দিকে আজকে আমাদের পিঠ ফেরাতে হয়েছে। যাক্, এসব বড় বড় পণ্ডিতমণ্ডলীর আলোচ্য বিষয়ে বেশি কিছু বলব না। তবে একটি কথা অস্বীকার করবার যো নেই যে, New Physics ব্যাপারটা মনের দেশে ভূমিকম্প ছাড়া আর কিছুই নয়।

সে যাই হোক্, বন্ধুবরের বিশ্বাস যে, হিন্দুধর্ম্ম ও astrology—দুই একই জিনিষ। তিনি কি একথা জানেন না যে, ইউরোপে Renaissance-এর মুখে যখন লোকে ধর্ম্মবিশ্বাস হারালে, সেই সময়েই তারা astrology-র অতিভক্ত হয়ে পড়ে? ভগবদ্ভক্তির স্থান তখন গ্রহ-নক্ষত্রগুলি গিয়ে অধিকার করলে। এ যুগটা আমাদের Renaissance-এর যুগ, অতএব সম্ভবতঃ ফলিত জ্যোতিষের ভক্ত হওয়া আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। সত্য কথা এই যে, ফলিত জ্যোতিষে কিম্বা ধর্ম্মে মানুষে সম্পূর্ণ বিশ্বাসও

করেনা, সম্পূর্ণ অবিশ্বাসও করেনা। তারপর আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম্মের শিকড় আলগা হয়ে গেছে, অথচ বিজ্ঞান আজও শিকড় গাড়েনি। স্থতরাং এই ভূমিকম্পের ধাক্কায় এ তুই বিশ্বাস যে পরস্পর ভেস্তে যাবে, তাতে আশ্চর্য্য কি ?

(৭)

আমার বন্ধুবর আরও লিখেছেন যে, "আমার মতে দেশের প্রকৃত লাভ হল এই, ভূগোল সম্বন্ধে জ্ঞানবৃদ্ধি। লোকে জানত না কোথায় মজঃফরপুর কোথায় দ্বারভাঙ্গা ইত্যাদি; কেবল জানত চাকরদের বাড়ী ঐ সব দেশে—কেন না 'লেড়কির সাদি' দিতে কিম্বা 'গওনা' করতে তারা ছুটি নিয়ে ঐ সব দেশে যেত; আর সাত দিনের বদলে তু'মাসে আসত।"

ভাল কথা। আর একটি দেশ ছিল, যা এই ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হয়েছে, যে দেশ থেকেও পাহাড়ী চাকররা আসে—অর্থাৎ নেপাল। সে দেশের Geography-ও কি আমরা জানি ?

তা'ছাড়া ভূমিকম্পের পূর্ব্বের উত্তর বেহারের Geography কি বাতিল হয়ে যায়নি ? ও প্রদেশের পুরানো ম্যাপ থেকে কি আর ও-দেশের চেহারা বোঝা যাবে ? গভর্ণমেণ্টের রিপোর্টে দেখলুম যে, ও-দেশে পূর্ব্বে যেখানে স্থল ছিল, এখন সেখানে জল; পূর্ব্বে যেখানে মাটি ছিল, এখন সেখানে স্থধু বালি। উত্তর বেহার এখন যথার্থই বিদেশ হয়ে গিয়েছে; ভবিষ্যতে এ দেশের আবার নূতন ম্যাপ আঁকতে হবে। আমরা ও-দেশের

Geography শিখি আর নাই শিখি, এ জ্ঞান আমাদের হবে যে, Geography কোন দেশেই চিরস্থায়ী নয়। পৃথিবীর যে সুধু খোসা আছে তাই নয়, তার শাঁসও আছে; আর শাঁসের গতিবিধি খামখেয়ালী অর্থাৎ অজ্ঞাত। পৃথিবীর পেটের খবর আমরা জানিনে।

গত ভূমিকম্প যে অভূতপূর্ব্ব বিরাট, তার প্রমাণ এ ভূমিকম্পের epicentre মোতিহারি থেকে মুঙ্গের পর্য্যন্ত ১৩৫ মাইল লম্বা; উপরন্তু এর নাকি একটি দ্বিতীয় epicentre আছে, যা মাঝপথে বেঁকে পূর্ণিয়া পর্য্যন্ত গিয়েছে। Epicentre মানে সেই স্থান, যেখান থেকে ভূমিকম্প ফুটে ও ফেটে বেরোয়। পৃথিবীর শাঁস যখন তরল, তখন তার খোসা অটল থাকবে কি করে? ডালিমের খোসার চাইতে পৃথিবীর খোসা বেশী টঙ্ক নয়, ভিতরের ঠেলায় যখন-তখন ফেটে ওঠে।

(৮)

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতদের মতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়াতে যে সর্ব্বনেশে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার সঙ্গে এ ভূমিকম্পের তুলনা হতে পারে।

এ যুগের একজন অগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক দার্শনিক—William James—প্রকৃতির এই ধ্বংস-লীলার সময় সে দেশে উপস্থিত ছিলেন; আর সে সময় তাঁর মনের দেশে কিরকম বিপ্লব ঘটে, তার একটি চমৎকার বর্ণনা লিখে রেখে গিয়েছেন। Bergson-এর মতে সে বর্ণনা একটী অপূর্ব্ব psychological দলিল।

James-এর মনে এই নৈসর্গিক উৎপাতের দরুণ কোনরূপ ভয় হয়নি, বরং তাঁর মনে যে ভাবের উদয় হয়, তাকে exhilaration বলা যায়। কিন্তু তাঁর মনে ভূমিকম্প সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান তন্মুহূর্ত্তে একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। এবং তার পরিবর্ত্তে এই ভূমিকম্প একটি ব্যক্তির আকার ধারণ করে দেখা দিয়েছিল, যেন সে ব্যক্তি ইচ্ছা করেই তাঁদের উপর এই অত্যাচার করছে। Bergson বলেন যে, শিক্ষিত লোকমাত্রেরই অন্তরে এক একটি আদিম মানব আছে, আর এইরূপ দুর্ঘটনার তাড়ায় সভ্য মানবের অন্তর্নিহিত সেই আদিম মানব গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে। আর তখন সে প্রাকৃতিক ঘটনাকেও personify করে। Mythology-র জন্মও এই কারণে ঘটে। সুতরাং আমার বন্ধুবরের অধ্যাপক বন্ধুরা যে এই ভূমিকম্পের ধাক্কায় ফলিত জ্যোতিষে আস্থাবান হবেন, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? Astrology-তে তখনই বিশ্বাস করা চলে, যখন আমরা গ্রহ-নক্ষত্রদের personify করি, আমাদের মতোই তাদের অন্তরে ইচ্ছা, অভিপ্রায় প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির আরোপ করি, এবং আকাশ-দেশের এই সব জড়পিণ্ডের সঙ্গে মনে মনে শত্রুতা ও মিত্রতার সম্বন্ধ স্থাপন করি।

(৯)

প্রচণ্ড ভূমিকম্প আমার কাছে অপরিচিত নয়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের উত্তর-বঙ্গের বিরাট ভূমিকম্পের সময় আমি নাটোরে উপস্থিত ছিলাম। তখন উক্ত সহরে বাঙলার বহু গণ্যমান্য

লোক একত্র হয়েছিলেন, কেননা সেখানে তখন বাঙলার প্রাদেশিক পলিটিকাল Conference-এর বৈঠক বসেছিল। সেদিন বেলা ছুটো আড়াইটের সময় জনৈক ভদ্রলোক যখন মহা বক্তৃতা করছেন, এমন সময় হঠাৎ মাটির নীচে ট্রেণ চলবার আওয়াজ পাওয়া গেল। ৺গুরুপ্রসাদ সেন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ব্যাপার কি? আমি উত্তর করলুম যে, ভূমিকম্প আসছে। তার পরেই পৃথিবী গা-মোড়ামুড়ি দিতে আরম্ভ করলে। তারপর বাইরে চেয়ে দেখি গরু-বাছুর সব পাগলের মত ছুটোছুটি করছে, ও আকাশ লাল হয়ে গেছে! বুঝলুম যে বাড়ী-ঘরদোর সব ভেঙ্গে পড়েছে, আর স্থরকি উড়ে আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। আমার সমবয়সী একটি আত্মীয় আমাকে বললেন, নাটোরের শিশু মহারাজকুমারকে বৈঠকখানায় শুইয়ে রেখে এসেছি, চলুন দেখিগে তার কি অবস্থা হল। এর পরেই আমরা ছু'জনে ছুটলুম। প্যাণ্ডাল থেকে নাটোরের রাজপ্রাসাদ বোধহয় আধ মাইল পথ। এই পথটি বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আসতে হল। প্রথমতঃ দেখলুম ধরণী বহু স্থানে দ্বিধা হয়ে গেছেন, সে সব ফাঁক আমাদের লাফিয়ে উত্তীর্ণ হতে হল। তার পর দেখি রাজবাড়ীর প্রকাণ্ড দ্বিতল প্রবেশদ্বার ভূমিসাৎ হয়েছে আর পিলখানা ভেঙ্গে পড়ায় একটি মহাকায় দাঁতলা হাতী দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে। পশু-পক্ষীরা ভূতত্ত্ব জানেনা বলেই এ অবস্থায় ভয়ে তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। কোনরকম করে হাতীটির পাশ কাটিয়ে, ইঁটের স্তূপের উপর

দিয়ে একরকম হামাগুড়ি দিয়ে এসে দেখি, মহারাজের বৈঠকখানা দাঁড়িয়ে আছে, আর মহারাজকুমারের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া ছাড়া আর কোনও বিপদ ঘটেনি।

অবশ্য সেবারেও মাটি ফেটেছিল, কিন্তু সে ফাটলের ভিতর দিয়ে বালিও ওঠেনি, জলও ওঠেনি, গন্ধকের ধোঁয়াও নির্গত হয়নি। বর্ত্তমান ভূমিকম্পের তুলনায় সে ভূমিকম্প একরকম দোল বললেও হয়; যদিও সে ভূমিকম্পের ফলে উত্তরবঙ্গের জিওগ্রাফি অনেকটা বদলে গেছে।

এখন আমার সেদিনকার মনোভাবের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিই। এ ব্যাপারে ভয় আমার বিন্দুমাত্রও হয়নি, বরং অপরের ভয়ের পরিচয় পেয়ে আমার একটু হাসি পেয়েছিল। এর কারণ বোধ-হয় তখন আমার পূর্ণযৌবন, আর তখনও আমি গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিনি। দ্বিতীয়তঃ William James-এর মত কোন-রূপ দার্শনিক মনোভাব আমার মনে উদয় হয়নি। মনে আছে, আমার বন্ধু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি আমাকে এসে বললেন—

"যোগস্থ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।"

যদিচ আমিও যোগস্থ হইনি, আমার বন্ধুও হয়নি, তবুও আমি নানা ছোট-খাটো কাজ নিয়েই সেদিন ব্যস্ত ছিলুম। এর কারণ বোধহয় প্রকৃতির এই কাঁপুনিটে একটা ক্ষণিক ব্যাপার—এই বিশ্বাস আমার মনে তখন বদ্ধমূল ছিল। আমার বিশ্বাস, আমাদের অধিকাংশ লোকের মনোভাবও তাই।

কিন্তু আজকের দিনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, বেহারের এই দুর্ঘটনার ফলে বাঙলারও অনেক ইকনমিক পরিবর্ত্তন ঘটবে। এর মানে বহু বেহারী বাঙলায় আসতে বাধ্য হবে, দেশে অন্ন-বস্ত্রের অভাবে। ফলে জনগণের মধ্যেও একটা ওলট-পালট হবে। এই ভূমিকম্পের জের ভবিষ্যতে আমাদের অনেকদিন টানতে হবে। মনে রাখবেন দ্বারভাঙ্গা আসলে দ্বারবঙ্গ। ঐ দুয়োর দিয়েই এদেশে আর্য্য সভ্যতা এসেছে, অনার্য্য ভূমিকম্পও এসেছে।

[ফাল্গুন—১৩৪০]

নবম প্রস্তাব

(১)

গত মাসের 'উদয়নে' আমি প্রসঙ্গতঃ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, গত ভূমিকম্পের প্রসাদে আমরা কি নেপাল নামক দেশের জিওগ্রাফি শিখেছি? নেপালের নাম আমরা সকলেই জানি, কিন্তু সে দেশের রূপ কি আমরা মনশ্চক্ষে দেখতে পাই?—এর স্পষ্ট উত্তর হচ্ছে, আমরা নেপালের জিওগ্রাফি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আর জিওগ্রাফির উপর যা গড়ে' ওঠে, অথবা মানুষে গড়ে' তোলে, অর্থাৎ ও-দেশের হিষ্টরিও আমরা জানিনে। এর কারণ এ দুই বিষয়ে স্কুলপাঠ্য কোনও পুস্তক অথবা পুস্তিকাও নেই,—যা মুখস্থ করে আমরা একজামিন পাশ করতে পারি, অর্থাৎ শিক্ষিত হই। যে জিনিষ আমরা চোখে দেখিনি, তার সম্বন্ধে আমরা জ্ঞানলাভ করি পরের মুখের কথা শুনে। কারণ পুঁথি পড়ার অর্থ হচ্ছে পরের কথা শোনা, পরের অভিজ্ঞতার প্রসাদে নিজে অভিজ্ঞ হওয়া। আমাদের জ্ঞানের আজও প্রধান ভিত্তি হচ্ছে শ্রুতি। এখন ভূমিকম্প-পীড়িত নেপালের হিষ্টরি-জিওগ্রাফির সন্ধান নেওয়া যাক।

আমি যতদূর জানি, নেপালের একমাত্র ইতিহাস হচ্ছে, জগদ্বিখ্যাত Orientalist Sylvain Lévi-র ফরাসী ভাষায়

লিখিত Etude Historiue d'un Royaume Hindou। এ পুস্তক হচ্ছে একখানি প্রকাণ্ড গ্রন্থ, তবে সুলিখিত বলে, আমাদের মত অপণ্ডিত লোকের পক্ষেও দুষ্পাঠ্য নয়। যদিচ এ পুস্তকে নেপালী ভাষার philology, নেপালি জাতির ethnology, নেপালি ইতিহাসের chronology, নেপালের দেব-দেবীর iconology প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের পণ্ডিতী বিচার আছে।

(২)

আমি উক্ত গ্রন্থ থেকে নেপালের হিষ্টরি-জিওগ্রাফি সম্বন্ধে যে যৎসামান্য জ্ঞান লাভ করেছি, সংক্ষেপে তার পরিচয় দেব—অবশ্য তার সর্ব্বপ্রকার ology-র পাশ কাটিয়ে। বলা বাহুল্য, গত ভূমিকম্পে নেপাল সম্বন্ধে আমার মনে যে কৌতূহল উদ্রেক করে, সেই কৌতুহল চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যেই আমি উক্ত বিরাট গ্রন্থ পাঠ করি। নেপাল পৃথিবীতে একমাত্র হিন্দুরাজ্য বলে সে দেশের পরিচয় লাভ করবার আমার লোভ ছিল।

হিন্দুরাজ্য যে কি কি কারণে ভেঙ্গে পড়ে, তা' আমরা কতকটা জানি; কিন্তু কি কি কারণে তা গড়ে' ওঠে, তা' আমরা মোটেই জানিনে। Sylvain Lévi-র গ্রন্থের মহাগুণ হচ্ছে, এ ইতিহাস শুধু নেপালের রাজারাজড়ার ফর্দ্দ নয়, নেপালীরা কি উপায়ে অসভ্য অবস্থা হতে সভ্য অবস্থায় উন্নীত হয়েছে, তারও ইতিহাস। যে জাতির মধ্যে সমাজ-বন্ধন আছে, যে জাতির অন্তরে ধর্ম্ম ও আর্ট উদ্ভূত হয়েছে, সে জাতিকেই আমরা

সভ্য বলতে বাধ্য। 'সভ্যতা' শব্দ তার কোনও সঙ্কীর্ণ অর্থে এস্থলে আমি ব্যবহার করছিনে। আর এই ভারতবর্ষই নেপালকে ধীরে ধীরে সভ্য করে তুলেছে। ভারতবর্ষের ধর্ম্ম, ভারতবর্ষের ভাষাই নেপালীরা গ্রহণ করেছে। মনু বলেছেন যে, "আচারঃ পরমো ধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত্ত এব চ"। তারপর মনু বলেছেন—

"এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥"

এই আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণরা কি উপায়ে, কি পদ্ধতি অনুসরণ করে তাঁদের আচার নামক পরমধর্ম্ম বিদেশীদের শিক্ষা দিয়েছেন, এ ইতিহাসে তারও পরিচয় পাওয়া যায়। নেপালে বহুকাল ধরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল, এবং কি কারণে ভারতবর্ষের মত সে দেশেও বৌদ্ধধর্ম্ম একটি অপদস্থ ধর্ম্মমাত্র হয়ে পড়েছে, তারও সন্ধান এ পুস্তকে মেলে। কিন্তু সে সব জানতে হলে মূলগ্রন্থ পাঠ করা প্রয়োজন। সঞ্জয় জম্বুদ্বীপের বর্ণনা সুরু করে বলেছিলেন, ধৃতরাষ্ট্র যখন ব্রহ্মবিদ্যার ধার ধারে না, তখন স্থূল জিওগ্রাফির কথা বলা যাক্।

(৩)

এখন আমিও নেপালের স্থূল জিওগ্রাফির কথা বলব। নেপালের দেশী বিলেতী অসংখ্য ম্যাপ আছে, কিন্তু তার জিওগ্রাফি নেই। এর কারণ দেশী ম্যাপগুলি কাল্পনিক, ও বিলেতী ম্যাপগুলি আনুমানিক। নেপালী পণ্ডিতদের হাতে সে সব

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ছিল না, যার সাহায্যে একটা গোটা দেশের ম্যাপ তৈরী করা যায়। অপর পক্ষে বিদেশী লোকের ওদেশে প্রবেশ নিষেধ, সুতরাং ইংরাজরা ‘তরাই’ থেকে theodolite-এর সাহায্যে যে মাপ-জোখ করেছেন, সেই মাপ-জোখের উপরেই তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে। অর্থাৎ দূরবীক্ষণের প্রসাদে যতদূর ঈক্ষণ করা যায়, তাই তাঁদের সম্বল। পণ্ডিতরা বলেন যে, পুরাকালে ইজিপ্টে কৃষকদের খণ্ড খণ্ড ক্ষেত্রের যে চিঠা-নক্সা তৈরী করা হত,—যেমন বাঙলা দেশের জমিদারী সেরেস্তায় আজও হয়,—সেই সব মাপ-জোখ অবলম্বন করেই গ্রীকরা Geography ও তার সহোদর ভাই Geometry নামক বিজ্ঞান দু’টি গড়ে’ তুলেছে। অর্থাৎ ভূমির জরিপই হচ্ছে আদি শাস্ত্র। আর এ জরিপ হচ্ছে রশির কিংবা নলের জরিপ। বিদেশী লোকের নেপালে প্রবেশ নিষেধ বলে, তারা ওদেশের এই মেঠো-জরিপ করতে পারে না। সুতরাং নেপাল নামক দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা আমাদের কাছে অবিদিত। নেপাল হচ্ছে হিমালয়ের ট্যাঁকে-গোঁজা দেশ, আর সে ট্যাঁক যা’তে অপরে কাটতে না পারে, সেজন্য নেপাল রাজ্যের সতর্কতার আর অন্ত নেই। সম্ভবতঃ হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুরাজ্য বাইরের সঙ্গে সম্পর্ক-রহিত হয়ে, একঘরে হয়েই টিঁকে থাকে।

আমরা এই পর্য্যন্ত জানি যে, নেপাল হচ্ছে একটি valley। ভাল কথা, valley-র বাঙলা কি ?—উপত্যকা, না অধিত্যকা ? অভিধানে দেখতে পাই—উপত্যকা মানে, পর্ব্বতের আসন্ন ভূমি,

আর অধিত্যকা মানে, পর্ব্বতের উপরিভূমি। তাই যদি হয় ত' নেপাল হচ্ছে যুগপৎ উপত্যকা ও অধিত্যকা। আর এ valley-র আকার oblong, এবং এর মাথার উপরে তিব্বত ও পায়ের নীচে ভারতবর্ষ। এই কথাটি মনে রাখলেই নেপালের ইতিহাসের মোটা কথাটি জানতে পারব। আর এ দেশে তিনটি নগর আছে; কাঠমাণ্ডু, পাটন ও ভাতগাঁও। গত ভূমিকম্পের ধাক্কায় এ তিনটি নগরই অল্প-বিস্তর বিধ্বস্ত হয়েছে।

(৪)

নেপাল ভারতবাসীদের কাছে বহুকালাবধি অপরিচিত ছিল। বেদে, পুরাণে, রামায়ণ-মহাভারতে নেপালের নাম পর্য্যন্ত নেই; যদিচ রামায়ণে ভারত-বহির্ভুক্ত নানা দেশের নামাবলি আছে। সম্ভবতঃ পৈশাচী ভাষায় লিখিত 'বৃহৎকথায় নেপালের উল্লেখ ছিল। কারণ 'বৃহৎকথা'র যে দু'টি সংস্কৃত সংস্করণ অদ্যাবধি প্রচলিত আছে, দু'টিতেই নেপালের উল্লেখ আছে। সংস্কৃত কাব্য দু'খানি খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে মূল 'বৃহৎকথা' অবলম্বনে রচিত। অপরপক্ষে মূল গ্রন্থখানি হয় লুপ্ত, নয় অনাবিষ্কৃত; সুতরাং সে গ্রন্থে যে নেপালের উল্লেখ ছিল, এমন কথা নির্ভয়ে বলা যায় না। আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচির মুখে শুনেছি যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে নেপালের না হোক্, নেপালের কম্বলের কথা আছে। এর থেকে প্রমাণ হয় যে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের বয়েস খুব বেশী নয়। আমার বিশ্বাস যে, ভারতবর্ষের ঈশান

কোণে মনু যে অপরাজিত দেশের কথা বলেছেন, সেই দেশ হচ্ছে নেপাল। আর্য্যাদের অপরাজিত দেশই হচ্ছে ভারতবর্ষের অপরিচিত দেশ। আর্য্যদের সন্ন্যাস অবলম্বন করে সে দেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবার বিধি ছিল। আর সম্ভবতঃ এই আর্য্য সন্ন্যাসীরাই সেদেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করেন। সে যাই হোক্, যে দেশের মাথার উপর তিব্বত ও পায়ের নীচে ভারতবর্ষ, সে দেশে যে এই দুই জাতির মিশ্রণ ঘটবে—এ ত' স্বাভাবিক। ফলে নেপালীদের দেহে তিব্বতী ও হিন্দুস্থানী—উভয়বিধ রক্ত আছে। এবং এই নেপালেই হিন্দুধর্ম্ম ও বৌদ্ধধর্ম্মের মিলন ঘটেছে। কাঠমাণ্ডুতে পশুপতিনাথ ও স্বয়ম্ভুনাথের মন্দির দু'টিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। গত ভূমিকম্পে শিবের মন্দির খাড়া আছে, কিন্তু বুদ্ধের মন্দির ভেঙ্গে পড়েছে। হিন্দুধর্ম্মের গুণই এই যে, তা যুগ যুগ ধরে মরে বেঁচে থাকে। এরই নাম কি Survival of the fittest?

(৫)

কোনও দেশের জিওগ্রাফি লিপিবদ্ধ করতে হলে, আগে যেমন সে দেশের চৌহদ্দি নির্ণয় করা প্রয়োজন; কোনও দেশের হিষ্টরি লিখতে হলে, আগে তার কালেরও চৌহদ্দি নির্ণয় করা প্রয়োজন। এখন ঠিক কবে থেকে নেপাল হিষ্টরির অন্তর্ভূ'ত হল—তা' বলা কঠিন।

যেমন রাজসরকারের চিঠা-নক্সা থেকেই জিওগ্রাফি উদ্ভূত হয়েছে, তেমনি রাজারাজড়ার বংশাবলী থেকেই আমরা হিষ্টরি

গড়েছি। এখন নেপালে রাজাদের একাধিক বংশাবলী আছে; সে সব বংশাবলী সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নাহলেও, তাদের সাহায্যেই ও-দেশের হিষ্টরি আমাদের গড়তে হবে। পুরাণের বংশাবলীর ন্যায় নেপালের বংশাবলীও নিঃসন্দেহে গ্রাহ্য নয়। এ দুই কুলজির কথাই প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে।

কালিদাস বলেছেন—

"সতাং হি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণ-প্রবৃত্তয়ঃ।" কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করবার বিষয়ে কালিদাসের মত গ্রাহ্য হতে পারে, বিশেষতঃ সৎলোকের পক্ষে। কিন্তু এ যুগে সত্যমিথ্যার বিচার আমরা অন্তঃকরণপ্রবৃত্তির সাহায্যে করতে পারিওনে, করিওনা। আমরা পুরাণের কথাও যাচিয়ে নিতে চাই, শিলা-লিপি প্রভৃতির সাহায্যে। Sylvain Lévi এই সব বাহ্য প্রমাণের সাহায্যে নৈপালিক বংশাবলীর কথা যাচিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। পাথরও অবশ্য মিথ্যা কথা কয়, কিন্তু আমাদের ধরে নিতে হবে যে, কাগজের উপর কলমের লেখার চাইতে পাথরের উপর বাটালি দিয়ে খোদা অক্ষর বেশি সত্য, কারণ বেশি টেঁক-সই। তাঁর মতে নেপালের হিষ্টরি সুরু হয়েছে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে, কারণ সেই যুগেই সে দেশে প্রথম epigraphy পাওয়া যায়। তার পূর্ব্বের কথা প্রাগৈতিহাসিক।

(৬)

এখন বংশাবলীর কথা শোনা যাক। নেপালের প্রথম রাজবংশ ছিলেন (১) আভীরবংশ, তারপরে (২) কিরাতবংশ।

এই গোপাল ও আভীরবংশ, সংস্কৃতভাষায় যাদের ও-নাম, তারা নয়। এরা হচ্ছে সব তিব্বতী লোক। প্রথমে তিব্বত থেকে লোক গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া চরাতে নেপাল উপত্যকায় নেমে আসে, এবং সেখানেই বসবাস করে, এবং তাদের মধ্যেই প্রধান ব্যক্তিরা ও-ভূভাগের রাজা হয়ে ওঠে। পরে কিরাতরা এ দেশ জয় করে, ও দেশের রাজা হয়। এই কিরাতরাও তিব্বতী লোক। এই গোপাল, আভীর এবং কিরাতরাও আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রকারদের নিকট নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র নামেই।

এর পর ভারতবর্ষ থেকে লিচ্ছবিরা নেপাল-অধিত্যকায় উঠে যায়, আর কিরাত রাজবংশকে উচ্ছেদ করে নেপালের রাজা হয়ে বসে।

এই লিচ্ছবি কুল বৌদ্ধ ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ। এদের রাজধানী ছিল বৈশালী। মনু এদের বলেছেন ব্রাত্য ক্ষত্রিয়। আর গুপ্তবংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা সমুদ্রগুপ্ত নিজেকে লিচ্ছবি কুলের দৌহিত্র বলে সাহঙ্কারে আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এই লিচ্ছবিরা ছিল বুদ্ধের উপাসক ও ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয়। এই সময় থেকেই নেপালে তিব্বতী ও হিন্দুস্থানী এই দুই জাতির মিলন ও মিশ্রণ সুরু হয়; এবং নেপালে হিন্দু সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম হল এই সঙ্কীর্ণ জাতির ধর্ম্ম, এবং এদের ভাষা হয়ে উঠল একরকম সংস্কৃতের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষের সভ্যতা তিব্বতী অসভ্যতার উপর জয়লাভ করলে। অর্থাৎ নেপাল ভারতবর্ষের অন্তর্ভূত হয়ে পড়ল।

(৭)

এই লিচ্ছবিরাজ কালক্রমে ঠাকুর রাজাদের হস্তগত হল। প্রথম ঠাকুর রাজা অংশুবর্ম্মণ ছিলেন শেষ লিচ্ছবিরাজের জামাতা।

রাজা অংশুবর্ম্মণের কাল হতেই নেপাল যথার্থ ইতিহাসের অন্তর্ভূত হল। অংশুবর্ম্মণ ছিলেন হর্ষদেবের সমসাময়িক রাজা। অর্থাৎ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকেই নেপালের যথার্থ ইতিহাসের সন্ধান পাওয়া যায়। চীনদেশের ইতিহাসেও তাঁর নাম পাওয়া যায়। এবং তিব্বতের জনৈক প্রবলপরাক্রান্ত নৃপতিকে তিনি কন্যাদান করতে বাধ্য হন। অংশুবর্ম্মণের কন্যাই তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের সুপ্রতিষ্ঠা করেন। অর্থাৎ তিব্বতকে ভারতবর্ষের culture-এর বশীভূত করেন। তদবধি তিব্বতের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্ম হয়েছে। এই নেপালের ভিতর দিয়েই তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠতা জন্মলাভ করেছে।

এই ঠাকুরবংশের পর মল্লবংশ নেপালের হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতা হয়ে ওঠেন। মল্লজাতি বৌদ্ধ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। ভগবান বুদ্ধ এই মল্লদের দেশেই দেহত্যাগ করেন। মনুসংহিতাতেও মল্লদের ব্রাত্যক্ষত্রিয় বলে গণ্য করা হয়েছে। ব্রাত্যক্ষত্রিয় হচ্ছে সাবিত্রীভ্রষ্ট ক্ষত্রিয়, অর্থাৎ তারা, যাদের উপনয়ন হয় না। সম্ভবতঃ লিচ্ছবি ও মল্লরা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেছিল বলে বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্ম সব ত্যাগ করেছিল। অথবা এরা যোদ্ধাজাতি ছিল বলে মনু এদের ক্ষত্রিয়শ্রেণীভুক্ত করে নিয়েছেন। সে যাই হোক,

মল্লরাও যে ভারতবর্ষীয় লোক, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই মল্লবংশীয় রাজারা সব বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু মনু প্রভৃতির ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ নেপালবাসীদের উপর আরোপ করেন। এই মল্লদের রাজত্বকালেই তিব্বতীদের সঙ্গে হিন্দুস্থানীদের রক্তের; বৌদ্ধ ধর্ম্মের সঙ্গে বৈদিক ধর্ম্মের; চৈনিক আর্টের সঙ্গে হিন্দু আর্টের পূর্ণ মিশ্রণ ঘটে। ফলে নেপালের সভ্যতা একটি বিশিষ্ট বর্ণ-সঙ্কর সভ্যতা। এই উপত্যকাতেই ভারতবর্ষ মহা-চীনের পাণিগ্রহণ করেছে—ফলে picturesque নেপালী সভ্যতা জন্মলাভ করেছে।

(৮)

পরে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে গুরখারা নেপালরাজ্য জয় করে' সে দেশের অধিপতি হয়েছে, এবং আজ পর্য্যন্ত নেপাল গুরখারাজেরই অধীন। এই গুরখারা কোন্ দেশ থেকে এলো, আর তারা কোন্ জাতের লোক ?

নেপালের পশ্চিমে অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য ছিল, এবং সে সব দেশ 'চব্বিশরাজ' বলেই পরিচিত। এই 'চব্বিশরাজে'র অন্যতম 'গোরক্ষ' রাজ্যই গুরখাদের আদি বাসভূমি। আর সিদ্ধযোগী গোরক্ষনাথই হচ্ছেন গুরখাদের কুলদেবতা।

কিম্বদন্তি এই যে, আলাউদ্দিনের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হয়ে একদল ক্ষত্রিয় চিতোর থেকে পালিয়ে এসে হিমালয়ের একটি উপত্যকায় আশ্রয় নেন। বলা বাহুল্য, তাঁদের সঙ্গে বহু

ব্রাহ্মণও ছিল। এবং এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ে মিলে হিলালয়ে একটি ক্ষুদ্র হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন। এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়দের অসবর্ণ বিবাহের ফলে এই গোরক্ষজাতির সৃষ্টি হয়। আর এই ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়রা 'স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি' এই বচন অনুসরণ করে স্থানীয় অধিবাসিনী তিব্বতী রমণীদেরও প্রত্যাখ্যান করেননি! আর এই সব অনুলোম বিবাহের সন্তান-সন্ততিও নিম্নশ্রেণীর গুরখা বলে পরিচিত ; সুতরাং এই গুরখা জাতিও বর্ণসঙ্করজাতি,—আধা হিন্দুস্থানী, আধা তিব্বতী। এই গুরখারা প্রধানতঃ যুদ্ধ-ব্যবসায়ী। এদের দেহে তিব্বতীদের শক্তি আছে, আর মনে ক্ষত্রিয়দের বীর্য্য আছে। হিন্দুধর্ম্মই এদের জাতিধর্ম্ম। ফলে গুরখারা নেপালে একটি নব-হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেছে। সে দেশে অবশ্য বৌদ্ধধর্ম্ম একেবারে লোপ পায়নি, একরকম মরে বেঁচে আছে। এই চীনেহিন্দুতে মেলামেশার ফলে নেপাল একটি museum হয়ে রয়েছে—শুধু প্রাচীন গ্রন্থের নয়, হিন্দু ও চৈনিক আর্টেরও। সুতরাং পুরাতত্ত্ববিদ্‌দের কাছে এই ক্ষুদ্ররাজ্য একটি মহা লোভনীয় অনাবিষ্কৃত দেশ। আমি যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব নেপালের হিষ্টরি, জিওগ্রাফির পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি। আশা করি এ প্রবন্ধ পড়ে নেপাল সম্বন্ধে লোকের কৌতূহল জাগ্রত হবে।

(৯)

গত ভূমিকম্পের প্রসাদেই আমার মনে নেপাল সম্বন্ধে কৌতূহল জন্মে, এবং সেই কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্যই

Sylvain Lévi-র বিরাট গ্রন্থ আমি পাঠ করেছি। সেই ইতিহাস থেকে আমি আর একটি সত্য উদ্ধার করেছি।

এ ভূমিকম্প নেপালে একটি প্রক্ষিপ্ত ঘটনা নয়। সে দেশে ইতিপূর্ব্বেও এ দুর্ঘটনা বার বার ঘটেছে। শুনতে পাই ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতরা বলেছেন যে, হিমালয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে বলেই এ ভূমিকম্প ঘটেছে। তা যদি হয় ত' এরকম ভূমিকম্প ভবিষ্যতে আরও হবে ; কারণ হিমালয় যথেষ্ট উঁচু হলেও আরও যে কত উঁচু হতে চায়, তা কেউ বলতে পারে না। এখন ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে দিয়ে, নেপালের অতীতের দু'চারটি ঘটনার উল্লেখ করি।

(১) নেপালের একখানি প্রাচীন পুঁথি দৃষ্টে আমরা জানতে পাই যে, ১২৫৫ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুন তারিখ হতে সুরু করে চার মাস ধরে সেখানে অবিরাম ভূমিকম্প হয়েছিল।

(২) তারপর রাজা শ্যামসিংহের রাজত্বকালে ১৪১০ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট তারিখে নেপালে একটি ভীষণ ভূমিকম্প হয়, যার ফলে ও-দেশ প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। এই ভূমিকম্পের প্রবল ধাক্কায় মৎস্যেন্দ্রনাথের মন্দির ও রাজপ্রাসাদ সব ধূলিশায়ী হয়।

এস্থলে বলা আবশ্যক যে, কিছুদিনের জন্য একটি ব্রাহ্মণ রাজবংশ নেপালের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। হরিসিংহ নামক মিথিলার জনৈক রাজা মুসলমানদের আক্রমণ রোধ করতে না পেরে, নিজরাজ্য ত্যাগ করে পাত্রমিত্র, গুরুপুরোহিত সমভিব্যাহারে নেপালে গিয়ে আশ্রয় নেন ; এবং অবশেষে নেপাল-

রাজ্য জবরদখল করেন। তিনিই প্রথমে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র নেপালে প্রচার করেন। রাজা শ্যামসিংহ এই হরিসিংহের বংশধর ও ব্রাহ্মণবংশের শেষ রাজা। এর পর জয়স্থিতিমল্ল সে রাজ্যে মল্লরাজবংশ সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। জয়স্থিতিমল্ল ছিলেন এই ব্রাহ্মণ রাজবংশের দৌহিত্র এবং হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের মহাভক্ত, যদিচ তিনি ছিলেন বৌদ্ধ।

(১০)

মৎস্যেন্দ্রনাথ হচ্ছেন নেপালের হিন্দুদের একটি প্রিয় দেবতা।

আজ পর্য্যন্ত মৎস্যেন্দ্রনাথের রথযাত্রা নেপালের প্রধান উৎসব। ইনি ইহলোকে ছিলেন মানুষ, পরলোকে গিয়ে দেবতা হয়ে উঠেছেন। কি জন্য, তা' বলছি। কিম্বদন্তি এই যে, নেপাল উপত্যকা পূর্ব্বে একটি হ্রদমাত্র ছিল। পরে বৌদ্ধদেবতা মঞ্জুশ্রী পাহাড় ফুটো করে জলনিকাশের পথ করে দেওয়াতে জলমগ্ন যে দেশ আবির্ভূত হল, সেই দেশের নামই নেপাল। কারণ, নেপালী বৌদ্ধদের সর্ব্বপ্রধান দেবতা হচ্ছেন মঞ্জুশ্রী। এ কিম্বদন্তির মূলে কোন সত্য আছে কি না, তা বলতে পারেন Geologist-রা।

নীচের জল চলে যাবার পর, নেপালদেশের উর্ব্বরতা নির্ভর করলে উপরের জল অর্থাৎ বৃষ্টির উপর। এক সময়ে ঘোর অনাবৃষ্টির ফলে নেপালের অধিবাসীরা অতি দুর্দ্দশাপন্ন হয়ে পড়েছিল। এমন সময় সিদ্ধযোগী মৎস্যেন্দ্রনাথ নেপালে উপস্থিত

হয়ে, যাগযজ্ঞ মন্ত্রতন্ত্রের কৃপায় সে দেশকে অনাবৃষ্টির হাত থেকে উদ্ধার করে অতিবৃষ্টির দেশ করে তুললেন। তদবধি তিনি সে দেশের রক্ষাকর্ত্তা দেবতা হয়ে উঠেছেন। এ কথাও সত্য কি না, তা বলতে পারেন Meteorologist-রা।

সে যাই হোক্, পণ্ডিত-সমাজের মতে মৎস্যেন্দ্রনাথ একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। তিনি ছিলেন যোগী গোরক্ষনাথের গুরু, এবং সম্ভবতঃ বাঙালী। মৎস্যেন্দ্রনাথ মীননাথ নামেও পরিচিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে যে সব প্রাচীন বাঙলার পদ সংগ্রহ করে এনেছেন, তার মধ্যে লুইপাদের পদগুলি নাকি মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচি মৎস্যেন্দ্রনাথের রচিত একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করছেন। সেই গ্রন্থের ভূমিকায় মৎস্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধ না হিন্দু বাঙালী না পাহাড়ী, তার বিচার থাকবে। কিন্তু একটি বিষয় নিশ্চিত। পূর্ব্ব ভূমিকম্পে মৎস্যেন্দ্র-নাথের মন্দির ধরাশায়ী হয়েছিল, এ ভূমিকম্পে সেটি খাড়া রয়েছে। এর ফলে নাকি নেপালের যুবক-সম্প্রদায়ের মনে দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি পুনর্জীবিত হয়েছে।

(১১)

নেপালের ইতিহাসে আর একটি ভূমিকম্পের সন্ধান পাই।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৫-এ সেপ্টেম্বর একটি ভীষণ ভূমিকম্প সমগ্র নেপাল রাজ্যকে বিধ্বস্ত করেছিল। পৃথিবীর উপর্য্যুপরি

চারটি ধাক্কায় কাঠমাণ্ডুতে ৬৪০টি, পাটনে ৪৮৪২টি, ভাতগাঁয়ে ২৭৪৭টি, সাঙ্কুতে ২৫৭টি এবং বানেপা সহরে ২৬৯টি ইমারত ভেঙ্গে পড়ে। তারপর ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে বাজ পড়ে' বারুদের গুদাম ধ্বসে যায়। আর তার এক পক্ষ পরে অতিবৃষ্টিতে সে দেশ ভেসে যায়।

এর থেকে দেখা যায় যে, যুগে যুগে নৈসর্গিক উৎপাতের ফল নেপালকে ভোগ করতে হয়েছে। তবে এতদিনে ভূমিকম্প বোধহয় নেপালের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কারণ নেপালের মহারাজা বড়লাটকে বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি পরের কাছে কিছু সাহায্য চান না। নেপালীরা নিজের বাহুবলে আবার তাদের ভাঙ্গা দেশকে গড়ে' তুলবে। আশা করি তারা তা করতে পারবে। হিমালয়ের ট্যাঁকে-গোঁজা নিকেলের সিকি-প্রমাণ এই ক্ষুদ্র দেশের খর্ব্বকায় অধিবাসীদের এই আত্মনির্ভরতার পরিচয় পেয়ে চমৎকৃত হতে হয়।

পূর্ব্বে যা বলেছি তার থেকেই অনুমান করতে পারেন যে, নেপাল হচ্ছে হিন্দুসভ্যতার যাত্নঘর—ভাষান্তরে museum। এই যাত্নঘরের প্রসাদেই আমরা আমাদের অতীতের অনেক সন্ধান পাবার আশা করি। এখনও অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, যাদের আমরা নাম শুনেছি কিন্তু সাক্ষাৎ পাইনি। হয়ত তারা নেপালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর মূল সংস্কৃত গ্রন্থেরও যদি আস্কারা করতে না পারি, তা'হলেও তার তিব্বতী অনুবাদ আমাদের হস্তগত হতে পারে। এই কারণে নেপালের পুস্তকাগার যে

অক্ষুণ্ণ রয়ে গিয়েছে, এটি পণ্ডিতদের পক্ষে একটি মহা সুসংবাদ, এবং আমাদের পক্ষেও ; কারণ আমরা পণ্ডিত নাহলেও তাঁদের আবহাওয়াতেই বাস করি।

(১২)

আমি আজ বৎসরাবধিকাল ধরে, 'উদয়ন'-পত্রের সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে মাসের পর মাস 'ঘরে-বাইরে'র আলোচনা করে এসেছি। এ আলোচনা এক হিসেবে ও-পত্রের নামের অনুযায়ী হয়নি। কারণ আমার আলোচনার অন্তরে উষার অরুণ-আলোক ততটা নেই, যতটা আছে গোধূলির ধূসর ছায়া। আমি বর্ত্তমানে, কি ঘরে কি বাইরে, মানবজাতির মুখে কিংবা বুকে, এমন কোনও আশার বাণী শুনতে পাইনি, যা শুনে মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। যে সব পুরোনো আচার, পুরোনো idea-র অনুসরণ করে মানুষ দিনের পর দিন উন্নতির সিঁড়ি ভাঙ্গছিল,—সে সিঁড়ি যে ভেঙ্গে পড়ছে, তা সকলেই দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু এই ভাঙ্গনের প্রসাদে নতুন কিছু যে গড়ে' উঠছে, তা তেমন প্রত্যক্ষ নয়। ফলে আমি বর্ত্তমান Economics, পলিটিক্স, শিক্ষা সম্বন্ধে এমন নানা কথা বলেছি, যাতে লোকের মন প্রসন্ন হয়না। বর্ত্তমান সভ্যতার বিশৃঙ্খলার পরিচয় পেয়ে আমার মন প্রসন্ন হয়নি, কাজেই অপরের মনেও আশার সঞ্চার করতে পারিনি।

এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতাকে মহামহিমময়রূপে কল্পনা করেন, আর সেই লুপ্ত

সভ্যতাকে উদ্ধার করাই আমাদের কর্ত্তব্য মনে করেন। অতীতকে যে ভবিষ্যতে রূপান্তরিত করা যায়—এই অদ্ভুত ধারণা আমি কস্মিনকালেও মনে পোষণ করিনি। সে অতীত আমাদের নেই, আর ভুলেও ফিরে আসবে না। আর আমাদের ভবিষ্যৎ যে আমাদের মনোমত ভবিষ্যৎ হবে, তার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না। এক্ষেত্রে কি অতীত, কি ভবিষ্যৎ, কোনও কালই আমাদের মনের আশ্রয়ভূমি হতে পারেনা। এ মনোভাবকে লোকে pessimism বলতে পারেন, আর pessimismটা এ যুগে নিন্দনীয়। সুতরাং আশা করি আগামী বৎসরের পয়লা তারিখ থেকে কোনও তরুণ লেখক optimism-এর সুর ধরবেন। আমি আজ থেকেই ক্ষান্ত হলুম। এর পর যদি আমার লেখবার প্রবৃত্তি থাকে ত' আমি সেই সব বিষয়ে কথা কব—যে সব কথা ঘরেরও নয়, বাইরেরও নয়।

[চৈত্র—১৩৪০]